ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ মাসুদ রহমান

শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম

মোহাম্মদ সালাউদ্দীন চৌধুরী

নাজমুন নাহার

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে এই শতাব্দীর শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এ সময়ে ব্যবসায়ের ধরন, অর্থায়ন ও ব্যাংকিং কার্যক্রম বদলে যাচ্ছে এবং এসবের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হচ্ছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর নির্দেশনা অনুযায়ী **ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং** বিষয়টি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	অর্থায়ন ও ব্যবসায় অর্থায়ন	১-১৪
২	অর্থায়নের উৎস	১৫-২৮
৩	শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার	২৯-৩৯
৪	অর্থের সময়মূল্য	৪০-৪৯
৫	ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা	৫০-৫৮
৬	মূলধনি আয়-ব্যয় প্রাক্কলন	৫৯-৭২
৭	মূলধন ব্যয়	৭৩-৮২
৮	মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং	৮৩-৮৯
৯	ব্যাংকিং ব্যবসায় ও তার ধরন	৯০-৯৯
১০	বাণিজ্যিক ব্যাংক	১০০-১০৭
১১	ব্যাংকের আমানত	১০৮-১১৭
১২	ব্যাংক ও গ্রাহক	১১৮-১২৩
১৩	কেন্দ্রীয় ব্যাংক	১২৪-১৩৪

প্রথম অধ্যায়

অর্থায়ন ও ব্যবসায় অর্থায়ন

Finance and Business Finance

সমাজ-সভ্যতার ক্রমবিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কার্যপরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পণ্য- বাজারে নানামুখী প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় মুনাফা অর্জন করতে হলে একজন ব্যবসায়ীকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থের সদ্ব্যবহার করতে হয়। এতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে সফল হয়। সে উদ্দেশ্যে সকল প্রতিষ্ঠান তার বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত উৎস থেকে সংগ্রহ করে এবং পণ্য-বাজারের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্রকল্পে তহবিল বিনিয়োগ করে। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অর্থের আগমন ও নির্গমনপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা একজন ব্যবসায়ীকে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করেও অধিক মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে। বর্তমানে অর্থায়নকে ব্যবসায়ের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- অর্থায়নের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- অর্থায়নের ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারব।
- অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- অর্থায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অর্থায়নের নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আর্থিক ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব।

ছবি : শিল্প

১.১ অর্থায়নের ধারণা

অর্থায়ন তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে। কোন উৎস থেকে কী পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করে কোথায়, কীভাবে বিনিয়োগ করা হলে ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ মুনাফা হবে, অর্থায়ন সেই সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মালামাল বিক্রয় থেকে অর্থের আগমন হয়। ব্যবসায়ে মালামাল প্রস্তুত ও ক্রয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের তহবিলের প্রয়োজন হয়। যেমন: মেশিনপত্র ক্রয়, কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকদের মজুরি প্রদান ইত্যাদি। এগুলো তহবিলের ব্যবহার। তহবিলের এই প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনামাফিক তহবিল সংগ্রহ করতে হয়, যেন উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহার-সংক্রান্ত এই প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

তোমার এলাকার কোনো দর্জির দোকানে গেলে দেখতে পাবে, একজন বা দুজন সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করছে। আবার হয়তো কেউ কাপড় কাটছে বা বোতাম সেলাই করছে। ফলে একটি দর্জির দোকানের মালিককে তার এই কার্যপ্রক্রিয়া সঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য সেলাই মেশিন ক্রয়, সুতা, বোতাম, কাঁচি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পরিমাণে ক্রয় করতে হয়। ব্যবসায়ের শুরুতে সাধারণত এসব ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল তিনি তার নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করে নির্বাহ করেন। ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের ঘাটতি হলে নিজস্ব মূলধনের সাথে কিছু পরিমাণ অর্থ আত্মীয়স্বজন থেকেও ঋণ নিতে পারে। ব্যবসায় চলাকালীন অবস্থায় মাসের শেষে কর্মচারীদের বেতন, দোকান ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য যে ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজন হয়, সেটি তিনি কাপড় সেলাই থেকে অর্জিত আয় হতে পরিশোধ করেন। এই আয় থেকে তাকে ঋণের অর্থ পরিশোধেরও পরিকল্পনা করতে হয়। একজন দর্জি দোকানের মালিকের সব সময় প্রত্যাশা থাকে, যেন ব্যবসায়ের আয় থেকে ব্যবসায়ের ব্যয় নির্বাহের পরও কিছু মুনাফা থাকে, যা দিয়ে তিনি নিজের পরিবারের নৈমিত্তিক খরচ মিটিয়েও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে পারেন কিংবা ব্যবসায় সম্প্রসারণে ব্যবহার করতে পারেন। সুতরাং একজন দর্জি দোকানের মালিক যদি তহবিলের উৎস ও ব্যবহার-সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তবেই তিনি সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। অন্যথায় দেখা যাবে, কাপড় সেলাই করতে সুতা প্রয়োজন কিন্তু নগদ অর্থ নেই বলে খরিদ্দার ফেরত যাচ্ছে। অথবা পুরাতন মেশিনটি পরিবর্তন করে নতুন মেশিন ক্রয় করার তহবিল নেই বলে ব্যবসায়টি বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। ব্যবসায় অর্থায়নে বা ফিন্যান্সে ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে কখন, কী কারণে, কত তহবিল প্রয়োজন এবং কোথা থেকে সেই তহবিল সরবরাহ করা উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরিবারেও অর্থায়নের প্রয়োগ আছে। সাধারণত প্রতিটি পরিবারের এক বা একাধিক আয়ের উৎস থাকে। চাকরি, ব্যবসায়, কৃষিকাজ, আত্মোউদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবারভেদে আয়ের সংস্থান হতে পারে। আবার দৈনন্দিন বাজার খরচ, বাড়িভাড়া, স্কুলের বেতন, বিভিন্ন বিল প্রদান ইত্যাদি খাতে পরিবারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় সংঘটিত হয়। আয়ের সাথে যেমন ব্যয়ের সংগতি রাখা প্রয়োজন, তেমনি ব্যয়ের সঠিক সময়ের দিকটাও সংগতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। যখন যে পরিমাণ ব্যয় প্রয়োজন, তখন সে পরিমাণ অর্থ না থাকলে হয়তো স্কুলের বেতন বকেয়া হয়ে যাবে, ফলে জরিমানাও দিতে হতে পারে। পূর্বপরিকল্পনামাফিক এই তহবিলের উৎস নির্ধারণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারই পরিবারের ক্ষেত্রে অর্থায়ন প্রক্রিয়া। নিত্যনৈমিত্তিক

এই ধরনের প্রয়োজন ছাড়াও মাঝেমধ্যে পরিবারকে তার আয়ের বাইরেও বড় অঙ্কের ব্যয় করতে হতে পারে। বাসায় নতুন টেলিভিশন কিংবা রেফ্রিজারেটর ক্রয়ের জন্য যদি আয়ের নিয়মিত উৎস থেকে অর্থ সরবরাহ করা সম্ভব না হয়, তখন দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঋণ ফেরত দেওয়ার একটি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন হয়। ফলে পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিকল্পনামাফিক তহবিলের উৎস নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা করতে অর্থায়নের ধারণা সহায়তা করে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও অর্থায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিচিত হওয়া যায়। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়, সেখানেও আয়-ব্যয় ও তহবিল ব্যবস্থাপনার একটি পরিকল্পনা থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত শিক্ষার্থীদের বেতন, পরীক্ষার ফি, ভর্তি ফি, এসব উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে। সুষ্ঠুভাবে ক্লাস পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে এই তহবিল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। যেমন: শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন, ঘরভাড়া প্রদান, বিদ্যুৎ বিল প্রদান, বিভিন্ন প্রকার সংস্কারমূলক ব্যয়, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটির বহুবিধ কার্যপ্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তহবিলের বিভিন্ন উৎস ও ব্যবহারের বিবিধ খাত বিবেচনা করে যথাযথভাবে তহবিল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে অর্থায়ন।

উপরের উদাহরণগুলোর মধ্যে দর্জির দোকান একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু পরিবার ও বিদ্যালয় মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান নয়। বর্তমান পাঠ মূলত মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায় বা কারবারি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন নিয়ে জড়িত। একজন মুদি দোকানির অর্থায়ন প্রক্রিয়াটি কেমন? মুদি দোকানি পণ্য বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে। আবার পণ্য বিক্রয়ের জন্য তাকে পণ্য ক্রয়, দোকানভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি চলতি খরচ, যা নিয়মিতভাবে সম্পাদন করতে হয়। আবার কখনো কখনো ক্রেতার প্রয়োজনে তাকে দোকানের আয়তন বৃদ্ধি, রেফ্রিজারেটর ক্রয় ইত্যাদি বড় আকারের খরচ করতে হয়। এগুলো তার স্থায়ী খরচ। ফলে মুদি দোকানি সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য চলতি ও স্থায়ী সম্পদে তহবিল বিনিয়োগ করে। বিক্রয়লব্ধ আয় হতে যদি বিনিয়োগের তহবিল সংস্থান করা না যায়, তবে তাকে বিভিন্ন উৎস যেমন: নিজস্ব তহবিল, বন্ধুবান্ধব, ধারে পণ্য ক্রয় ইত্যাদি থেকে তহবিল জোগাড় করতে হয়। আবার স্থায়ী সম্পদ অর্জনের জন্য যে বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হয়, সেটি সাধারণত বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এতে দীর্ঘমেয়াদে অর্থ পরিশোধের সুযোগ থাকায় ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি কিছুটা কমে যায়। মুদি ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে বিক্রয়লব্ধ অর্থের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে চলতি ব্যয় নির্বাহ, কিছু দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, কম ঝুঁকিপূর্ণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে, সঠিক সময়ে ঋণের কিস্তির পরিশোধ সম্পর্কিত তহবিল ব্যবস্থাপনা ব্যবসায় অর্থায়নের মূল কাজ।

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, বাটা কোম্পানি, কোহিনূর কেমিক্যালস এসব বড় পরিসরের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় কোম্পানি। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন প্রক্রিয়া মুদি দোকান বা দর্জির দোকানের মতো সরল নয়; বরং অপেক্ষাকৃত জটিল। একটি কোম্পানি অর্থ বা তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে ছোট প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু ভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমন কোম্পানি তার প্রয়োজনীয় তহবিল মূলত শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। প্রতিষ্ঠানের সুনাম, মুনাফার হার, গ্রাহকসেবা বা ভোক্তা সন্তুষ্টি শেয়ারবাজারে শেয়ারের

মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিভিন্ন উৎসের মধ্যে কোন উৎস, কখন, কী পরিমাণে ব্যবহার করে তহবিল সংগ্রহ করা উচিত এবং কোন কোন খাতে কী পরিমাণে তা কীভাবে খরচ বা বিনিয়োগ করে মুনাফা বৃদ্ধি করা যায়, ব্যবসায় অর্থায়ন তা নিয়ে আলোচনা করে এবং দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

দলগত কাজ : পরিবারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

১.২ অর্থায়নের ক্রমোন্নয়নের ধারা

সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের পরেই উৎপাদন কৌশল জটিলতর হয় এবং বিশেষায়িত ও বিভাজিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন-প্রক্রিয়া উৎকর্ষ লাভ করে। বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে অর্থায়ন-সংক্রান্ত ধারণা ও ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। হিসাবশাস্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিন্যান্স মূলত আর্থিক বিবরণীর বিচার-বিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত ছিল। ক্ল্যাসিক্যাল ধারার ব্যষ্টিক অর্থনীতির উন্নতির সাথে সাথে ব্যবসায়ের নিজস্ব ও বিশেষায়িত অর্থনীতি নিয়েও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থায়ন সম্পৃক্ত ছিল। অর্থায়নের ক্রমবিকাশের এই ধারা অর্থায়নের প্রকৃতি ও আওতা সম্পর্কে আমাদের একটি অর্থবহ ধারণা দেয়। গতানুগতিক ধারায় আর্থিক ব্যবস্থাপকদের প্রধান দায়িত্ব ছিল হিসাব সংরক্ষণ ও তা বিশ্লেষণপূর্বক ভবিষ্যৎ কার্যক্রম প্রণয়ন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করা এবং নগদ অর্থের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তার প্রদেয় বিলগুলো যেন যথাযথ সময়ে পরিশোধে সমর্থ হয়, তাও অর্থায়নের ক্রমবিকাশের ধারায় অর্থায়নের কাজ হিসেবে যুক্ত হয়। কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আর্থিক ব্যবস্থাপকদের দায়িত্বকে পরিবর্তিত করেছে। অর্থায়নের বিকাশের মূল চারণভূমি যুক্তরাষ্ট্রে অর্থায়নের যে বিবর্তন গত শতাব্দীতে সংঘটিত হয়েছে তা পরে সারা বিশ্বেই অর্থায়নের বিবর্তনের ধারা হিসেবে পরিচয় লাভ করে।

অর্থায়নের ক্রমোন্নয়নের ধারাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপনে দেখা যায় :

ক. ১৯৩০-এর পূর্ববর্তী দশক : এই সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর মধ্যে একত্রীকরণের প্রবণতা শুরু হয়। আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন প্রতিষ্ঠান একত্রীকরণ হওয়া উচিত এই সংক্রান্ত রূপরেখা দিতে আর্থিক ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারা এই একত্রীকরণে বিশাল অঙ্কের অর্থসংস্থান ও আর্থিক বিবরণী তৈরি করার দায়িত্ব পালন করেন।

খ. ১৯৩০-এর দশক : একত্রীকরণ প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট সফলতা পায়নি। আগের দশকে একীভূত অনেক প্রতিষ্ঠানই পরের দশকে দেউলিয়া হয়ে যায়। উপরন্তু ত্রিশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে চরম মন্দা শুরু হয়। অনেক লাভজনক প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্তের তালিকায় পড়ে যায়। ফলে ব্যবসায়গুলো পুনর্গঠন করে কীভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা করা যায়, এ ব্যাপারে আর্থিক ব্যবস্থাপক বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় থেকেই শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অর্থায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়।

গ. ১৯৪০-এর দশক : এ সময়ে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য তারল্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। নগদ অর্থপ্রবাহের বাজেট করে সুপরিকল্পিত নগদপ্রবাহের মাধ্যমে অর্থায়ন সেই দায়িত্ব পালন করে।

ঘ. ১৯৫০-এর দশক : এই দশকে অর্থায়ন পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সর্বোচ্চ লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্প মূল্যায়নে নানা প্রকার গাণিতিক বিশ্লেষণ কাজে নিয়োজিত হয়। সুদূরপ্রসারী প্রাক্কলনের মাধ্যমে উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করে বিক্রয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস করে মুনাফা সর্বোচ্চ করাই তখন অর্থায়নের প্রধান কাজে পরিণত হয়। এই ধারাকে অর্থায়নের সনাতন ধারা হিসেবে গণ্য করা হয়।

ঙ. ১৯৬০-এর দশক : এই সময় থেকেই আধুনিক অর্থায়নের যাত্রা শুরু। অর্থায়ন মূলধন বাজারকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। শেয়ারহোল্ডাররা প্রতিষ্ঠানের মালিক ফলে শেয়ার হোল্ডারদের সম্পদ বা শেয়ারের বাজারদর সর্বাধিকীকরণই ছিল এই সময়ের অর্থায়নের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার ক্ষেত্রে নানা রকম আর্থিক বিশ্লেষণমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। অর্থায়নে ঝুঁকির ধারণা বুঝিয়ে দেয় যে মুনাফা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাধারণত ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মুনাফা বৃদ্ধি সর্বদা কাঙ্ক্ষিত নাও হতে পারে।

চ. ১৯৭০-এর দশক : এই দশকে কম্পিউটার অধ্যায়ের শুরু হয়, যা শুধু উৎপাদন কৌশলই নয়, ব্যবসায় অর্থায়নকেও পাল্টিয়ে দেয়। অর্থায়ন এখন অঙ্কনির্ভর হয়ে উঠেছে। বেশির ভাগ আর্থিক সিদ্ধান্ত মূলত জটিল অঙ্কনির্ভর এবং কম্পিউটারের মাধ্যমেই তা সুচারুরূপে সম্পাদন করার প্রবণতা এই সময়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়। যেমন ঝুঁকির ধারণা এখন অনেকটা সঠিকভাবে পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা করা হয়। মূলধনি কাঠামোর সনাতন ধারণাও অনেক জটিল ও অঙ্কনির্ভর হয়। এই সময় যেসব তাত্ত্বিক ব্যবসায় অর্থায়নকে নানা তত্ত্বের বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ করেছিলেন, তাদের মধ্যে হ্যারি মার্কোইজ, মার্টন মিলার, মডিগ্লিয়ানি ছিলেন উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে ১৯৯০-এর দশকে এসব তাত্ত্বিকগণ গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থায়নের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ছ. ১৯৮০-এর দশক : ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য অর্থায়ন তার সনাতনী দায়িত্বের পরিবর্তন করে নতুনরূপে আবির্ভূত হয়। এই সময় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে মূলধনের সুদক্ষ বন্টন ও প্রকল্পগুলো হতে অর্জিত আয়ের বিচার-বিশ্লেষণই ছিল অর্থায়নের মূল বিষয়।

জ. ১৯৯০-এর দশক ও আধুনিক অর্থায়নের সূচনা : এই দশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বব্যাপী আমদানি-রপ্তানির প্রতিবন্ধকতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। অর্থায়নও এ সময়ে আন্তর্জাতিকতা লাভ করে। একদিকে যেমন অর্থায়নের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত পৃথিবীর কোথায়, কোন পণ্য প্রস্তুত করা ও বিক্রয় করা লাভজনক সেটা বিবেচনা করে, আরেকদিকে বিশ্বের কোন মূলধনি বাজার কী প্রকৃতির ও কোথা থেকে তহবিল সংগ্রহ করা লাভজনক, তাও অর্থায়নের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। ফলে অর্থায়ন হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় একটি প্রায়োগিক সমাধানের ক্ষেত্র, যা হিসাবরক্ষণ, অর্থনীতি ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়গুলোকে সংমিশ্রণ করে সৃষ্টি হয়েছে।

> **দলগত কাজ :** বর্তমান ও অতীতের আর্থিক ব্যবস্থাপকদের কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

১.৩ অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ

অর্থায়ন প্রক্রিয়া একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি, একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই একেকটি অর্থায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন রূপ নেয়। এবার আমরা অর্থায়নের এই ধরনের একটি শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করব।

ক. পারিবারিক অর্থায়ন

পারিবারিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করে, সেই আয় কীভাবে ব্যয় করলে পরিবারের সদস্যদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়, তা নির্ধারণ করা হয়। পরিবারের প্রয়োজনীয় অসংখ্য ব্যয়ের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়গুলো পূরণ করা হয়। পরিবারের আয় যদি ব্যয়ের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ব্যক্তি, বন্ধু-বান্ধব থেকে অর্থ ঋণ হিসাবে নেওয়া যায়। নিয়মিত আয়ের সাথে সংগতি রেখে নিয়মিত ব্যয়সমূহ নির্ধারণ করা হয়। স্থায়ী সম্পদ যেমন: টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি, গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া যায়। কিন্তু সংগৃহীত তহবিল সীমাবদ্ধ বলে এর উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন। যদি পরিবারের সংগৃহীত তহবিল প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনায় বেশি হয়, তবে সেটা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করা হয়।

খ. সরকারি অর্থায়ন

প্রতিটি সরকারের একটি অর্থ ব্যবস্থাপনা আছে। একটি সরকারের প্রেক্ষাপটে তার বার্ষিক ব্যয় কোন কোন খাতে কী পরিমাণে হবে এবং সেই অর্থ কোন কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা যাবে, তা সরকারি অর্থায়নে আলোচনা করা হয়। সরকারকে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অনেক খাতে অর্থ ব্যয় করতে হয়, যেমন: রাস্তাঘাট, সেতু, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি হাসপাতাল, আইন-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা, সামাজিক অবকাঠামো ইত্যাদি। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, যেমন: আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, গিফট ট্যাক্স, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদি। সরকারি অর্থায়নে প্রথমে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করা হয়। সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য সমাজকল্যাণ। সরকারি অর্থায়ন সাধারণত অলাভজনক হয়। সরকারি অর্থায়নের ব্যয়, আয় অপেক্ষা বেশি হতে পারে। সরকারি মালিকানার বেশ কিছু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থাকে, যা অপেক্ষাকৃত কম লাভজনকও হতে পারে। যেমন: BCIC (Bangladesh Chemical Industries Corporation)-এর অধীনে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো। আবার বড় বড় সেতু, ফ্লাইওভারের মতো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, যদি সরকারের বাজেট হতে সম্পূর্ণ অর্থের সংস্থান করতে হয়। অনেক সময় সরকারের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাজনিত ব্যয়ের জন্য অর্থের সংকট সৃষ্টি হতে পারে। ফলে অনেক সময় সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে। যেমন: ADB (Asian Development Bank), বিশ্বব্যাংক, IDB (Islamic Development Bank) ইত্যাদি।

গ. আন্তর্জাতিক অর্থায়ন

আন্তর্জাতিক অর্থায়নে আমদানি ও রপ্তানির খাতগুলো নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। বাংলাদেশ প্রধানত আমদানিনির্ভর দেশ। প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী, কাঁচামাল, মেশিনারিজ, ঔষধ, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়। অপরপক্ষে বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাতদ্রব্য, তৈরি পোশাক, কৃষিজাত দ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানি করা হচ্ছে। রপ্তানি হতে আমদানি বেশি করতে হয় বলে প্রতিবছর বিরাট অংকের বাণিজ্যঘাটতি দেখা যায়। এই ঘাটতি পূরণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থ বা রেমিটেন্স বিশেষ ভূমিকা রাখে। আন্তর্জাতিক অর্থায়নে আমদানি ও রপ্তানি খাতসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এ সংক্রান্ত ঘাটতি কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় তা আলোচনা করা হয়।

একক কাজ : শিক্ষক 'দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বৃদ্ধিতে করণীয়' শীর্ষক একটি আলোচনা ক্লাসের আয়োজন করবেন এবং পরবর্তী ক্লাসের জন্য এ বিষয়টির উপর একটি বাড়ির কাজ দিবেন।

ঘ. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থান

সমাজে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থাকে, যা মানবকল্যাণে বা দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিয়োজিত। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অর্থ বা অর্থের সমতুল্য পণ্য বা সেবার প্রয়োজন আছে এবং সেই অর্থের দক্ষ ব্যবস্থাপনারও প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রে অর্থায়ন যে ভূমিকা রাখে তা হচ্ছে অর্থ ও অর্থ সমতুল্য সম্পদ সংগ্রহের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সেবামূলক উদ্দেশ্যকে সফল করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি এতিমখানা মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নয়। তবে এটিরও অর্থের প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে এরা অর্থ সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করা হয় এতিমদের বিভিন্ন উন্নয়নে। ফলে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং উদ্দেশ্য অর্জনে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাই অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের মূল উদ্দেশ্য।

ঙ. ব্যবসায় অর্থায়ন

অর্থায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরন হচ্ছে ব্যবসায় অর্থায়ন বা বিজনেস ফাইন্যান্স। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে লাভক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে গঠিত সংগঠনকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলা হয়। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার তহবিল সংগ্রহ ও বিনিয়োগের জন্য যে অর্থায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, সেটিই ব্যবসায় অর্থায়ন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়: একমালিকানা ব্যবসায়, অংশীদারি ব্যবসায় ও যৌথমূলধনি ব্যবসায়। এই তিন প্রকার প্রতিষ্ঠানেরই অর্থায়নের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও অর্থ ব্যবস্থাপনা। অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বীয় মূলধন ও ঋণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায় অর্থায়নই এই পাঠের মূল বিষয়।

বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাধারণত ছোট প্রতিষ্ঠান, যা একমালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায় হিসেবে গঠিত। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রাম-গঞ্জের হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, মুদি দোকান, সেলুন, বুটিক শপ ইত্যাদি এই ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। একমালিকানা প্রতিষ্ঠানে লাভ হলে মালিক একা ভোগ করে, লোকসান হলে ক্ষতিপূরণের জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ব্যবহৃত হয়।

অংশীদারি প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের মধ্যে ঝুঁকি বন্টিত হয় বিধায় ব্যবসায়ের আর্থিক ক্ষতি বহনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এ ধরনের একমালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তহবিল সংগ্রহের উৎস মালিকের নিজস্ব তহবিল, মুনাফা, আত্মীয়স্বজন থেকে গৃহীত ঋণ, ব্যাংক অথবা গ্রামীণ মহাজন থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ। সুতরাং নিজস্ব তহবিল নিয়োগ করে এর যথাযোগ্য ব্যবহার নিশ্চিত করে মুনাফা অর্জন করাই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের মূল উদ্দেশ্য।

যৌথমূলধনি কোম্পানির অর্থায়ন প্রক্রিয়া ভিন্ন ধরনের। একটি প্রতিষ্ঠান যৌথমূলধনি হতে হলে সরকারি অনুমোদন নিতে হয়। সরকার অনুমোদন দেওয়ার আগে ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ পরিচালকগণের পরিচয়পত্র, ব্যবসার উদ্দেশ্য ও নানাবিধ দলিলাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে। অনুমোদন পেলে একটি কোম্পানি তার বড় অঙ্কের কাঙ্ক্ষিত মূলধনকে ছোট ছোট অঙ্কে বিভক্ত করে শেয়ার হিসেবে বিক্রয় করে। যেমন: ১০ কোটি টাকার মূলধন ১,০০০ টাকার ১ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত করে সাধারণ জনগণের কাছে বিক্রয় করা হয়। একেকটি শেয়ারের মূল্য মাত্র ১,০০০ টাকা হওয়ার কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছোট বিনিয়োগকারীরাও কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারে। শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির মালিক এবং প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারহোল্ডাররা শেয়ারবাজার যেমন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার বিক্রয় করে শেয়ারটি নগদ অর্থে রূপান্তর করতে পারে। শেয়ার ছাড়া বন্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করেও যৌথমূলধনি ব্যবসায় সাধারণ জনগণ থেকে ঋণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চারহোল্ডার অর্থাৎ যারা ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র ক্রয় করে, তাদেরকে নির্দিষ্ট হারে নিয়মিতভাবে সুদ প্রদান করতে হবে। কেননা তারা শেয়ারহোল্ডারদের মতো কোম্পানির মালিক নন।

দলগত কাজ : পাঠ্যপুস্তকের উদাহরণগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি তুলনামূলক ছক প্রস্তুত করো।

চ. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সাধারণত সে দেশের ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক– এ ধরনের সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মুনাফাভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, তবে এগুলোর অর্থায়ন প্রক্রিয়া সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এই ব্যাংকগুলো মানুষের ক্ষুদ্র তহবিলকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন মেয়াদি আমানত সৃষ্টি করে এবং আমানতকারীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে। আবার এই তহবিল থেকে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান করে। এছাড়া ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রয়োজনেও ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া যায়। এই ঋণের উপর ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য করে। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক ঋণগ্রহীতার জন্য ধার্যকৃত সুদের হার আমানতকারীকে প্রদেয় সুদের হার হতে অপেক্ষাকৃত বেশি। এই দুধরনের সুদের হারের পার্থক্যই ব্যাংকগুলোর মুনাফা। ব্যাংকিং অংশের অধ্যায়গুলোতে আমরা এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাড়া কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হলো ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ অর্থায়ন সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ইত্যাদি। এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিন্ন ভিন্ন খাতের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১.৪ ব্যবসায় অর্থায়নের গুরুত্ব

বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক মুক্তবাজার ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনের জন্য প্রতিটি সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে পূর্বপরিকল্পনামাফিক অর্থায়ন করতে হয়। সুচিন্তিত ও সুদক্ষ অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার ব্যবহারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়। নিচের বিষয়সমূহ অর্থায়ন ব্যবস্থাপনাকে অধিক অর্থবহ করে তোলে।

ক. ব্যাবসায়িক মূলধন-সংকট

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থায়ন সম্পর্কিত ধারণা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ বলে আর্থিক সংকট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই সংকটের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করা একটি দুরূহ কাজ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল কেনা প্রয়োজন কিন্তু অর্থসংকটের জন্য প্রতিষ্ঠানটি যদি যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচামাল কিনতে অপারগ হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। অর্থায়ন-সংক্রান্ত ধারণা তাকে পরিকল্পনামাফিক যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ ও তার যথার্থ ব্যবহারে সহায়তা করে।

খ. অনগ্রসর ব্যাংক ব্যবস্থা

উপরন্তু উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট সুসংগঠিত নয় বলে ঋণের জন্য আবেদন করলেও কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে ঋণ পাওয়া যায় না। অনেক সময় ব্যাংক ঋণের বিপরীতে যে সম্পত্তি বন্ধক

রাখতে হয়, তার অপ্রতুলতার কারণে ব্যাংক ঋণ উপযুক্ত সময়ে ও যথার্থ পরিমাণে পাওয়া যায় না। ফলে ব্যবসায়ীদের এ অর্থসংকট হতে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য খুবই পরিকল্পিতভাবে অর্থের সংস্থান করতে হয় এবং সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অর্থের লাভজনক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যবসায়ীদের এ ধরনের সমস্যা পূর্বানুমান করতে সাহায্য করে এবং যেসব পদ্ধতিতে তা মোকাবিলা করা যায় তার ধারণা দেয়।

গ স্বল্পশিক্ষিত উদ্যোক্তা

বাংলাদেশের বেশির ভাগ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা স্বল্পশিক্ষিত বলে তারা একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। এতে করে অনেক লাভজনক প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত আর্থিক পরিকল্পনার অভাবে আর্থিক সংকটে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না এবং অবশেষে লাভের বদলে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অথচ এই ক্ষতির কারণ শুধু আর্থিক অব্যবস্থাপনা। অর্থায়ন ব্যবস্থাপনাবিষয়ক জ্ঞান থাকলে সহজেই একজন ব্যবসায়ী পরিকল্পনামাফিক স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সংস্থান করে তার সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে।

ঘ উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ ও জাতীয় আয়

একটি সফল বিনিয়োগ জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। অর্থায়নবিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োগে একজন ব্যবসায়ী বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে লাভজনক প্রকল্পটি বেছে নিতে পারে। এই ধরনের লাভজনক বিনিয়োগ ব্যবসায়টির জন্য যেমন অর্থবহ, তেমনি সারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দলগত কাজ : ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য অর্থায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

১.৫ ব্যবসায় অর্থায়নের নীতি

ব্যবসায় অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা বলতে ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনমাফিক তহবিল সংগ্রহ, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে সেই তহবিল বিনিয়োগ এবং তহবিল বণ্টনসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। এই ব্যবস্থাপনার কিছু নীতিমালা আছে, যা নিচে তুলে ধরা হলো।

ক. তারল্য বনাম মুনাফানীতি

একজন মুদি দোকানি তার প্রতিদিনের বিক্রয়লব্ধ নগদ আয় (তরল সম্পদ) সম্পূর্ণটাই কাঁচামাল ক্রয় ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয়ের কথা চিন্তা করে নিজের কাছে রেখে দিতে পারে অথবা সেই নগদ অর্থের কিছু অংশ কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য রেখে বাকিটা কোনো ব্যাংকের একাউন্টে জমা রাখতে পারে, যা থেকে নির্দিষ্ট সময়ে কিছু সুদ/মুনাফা পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে দোকানিকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, নগদ অর্থ কী পরিমাণ নিজের কাছে রাখলে দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানো সম্ভব। যদি নগদ অর্থ বেশি পরিমাণে দোকানি নিজের কাছে রেখে দেয়, তাতে ব্যাংক থেকে প্রাপ্য আয়ের পরিমাণ কমে যাবে। আবার ব্যাংকে বেশি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলে ব্যবসায়ের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের ঘাটতি হবে, যা ব্যবসায়ের সুষ্ঠু পরিচালনাকে ব্যাহত করবে। ফলে ব্যবসায়ীকে তারল্য ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রেখে আর্থিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে। অর্থাৎ একদিকে তাকে যেমন দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার মতো নগদ অর্থ হাতে রাখা প্রয়োজন, অন্যদিকে মুনাফা অর্জনের জন্য সেই অর্থ বিনিয়োগ করাও প্রয়োজন। নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক। নগদ অর্থ বেশি রাখলে মুনাফা কমে যায়, আবার মুনাফা বৃদ্ধিকল্পে বেশি বিনিয়োগ করা হলে তারল্যে ঘাটতি হয়। তারল্য ও মুনাফার মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখা অর্থায়নের একটি অন্যতম নীতি।

খ. উপযুক্ততার নীতি

স্বল্পমেয়াদি তহবিল দিয়ে চলতি মূলধন ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল দিয়ে স্থায়ী মূলধন সরবরাহ করা অর্থায়নের একটি নীতি। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালিয়ে রাখার জন্য যে নিত্যনৈমিত্তিক অর্থের প্রয়োজন হয়, সেটিই চলতি মূলধন; যেমন: কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রদান ইত্যাদি। অন্যদিকে মেশিন ক্রয়, ব্যবসায়ের দালানকোঠা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন মূলধন। চলতি মূলধনের পরিমাণ কম হয় বলে এটি স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা ভালো। বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিভিন্ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ ব্যাংক, ডিবেঞ্চারহোল্ডার, এই ধরনের উৎসগুলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। পক্ষান্তরে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা করা উচিত। দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের জন্য ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক হারে সুদ প্রদান করতে হয়। ফলে যদি চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তবে দেখা যায় উপার্জিত আয় হতে ঋণের সুদ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে যায়।

গ. ব্যবসায়ের বৈচিত্র্যায়ণ ও ঝুঁকি বন্টননীতি

ছবি: কারবারে পণ্যের বৈচিত্র্যায়ন

তহবিল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবা যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্যপূর্ণ হলে ব্যবসায়ের ঝুঁকি বন্টিত হয় ও হ্রাস পায়। প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। ফলে ব্যবসায়কে নানামুখী ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। এই ঝুঁকিগুলো বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন, বাজারে নতুন পণ্যের উপস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি। এসব পরিবর্তনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা বা এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ব্যবস্থাপকদের পক্ষে সাধারণত সম্ভব নয়। তবে ঝুঁকি বন্টনের নীতি অনুসরণের ফলে অনিশ্চিত বাজার পরিস্থিতিতেও প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন সম্ভব। একজন ব্যবসায়ী যদি শুধু একধরনের পণ্যের ব্যবসায় করে, তাহলে ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জন বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ব্যবসায়ের পণ্য যদি বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়, তাহলে ঝুঁকি বন্টিত হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো একটি পরিস্থিতিতে একটি পণ্যের বিক্রয় হ্রাস পেলে অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় দিয়ে ব্যবসায়টির হ্রাসকৃত বিক্রয় পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়, ফলে সব ধরনের অবস্থায় কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয়। একজন মুদি ব্যবসায়ী যদি তার দোকানে সনাতনী সাবান ও হালাল সাবান দু'ধরনের সাবানই বিক্রয় করেন তবে দু'ধরনের ক্রেতারই দোকানে সমাগম হবে। দোকানি যদি শুধু সাধারণ বা সনাতনী সাবান রাখেন, তবে হালাল সাবানের ক্রেতারা অন্য দোকানে গিয়ে হালাল সাবান কিনবে, এতে শুধু সনাতনী সাবান বিক্রেতার মোট বিক্রয় হ্রাস পাবে। আবহাওয়া ও ঋতুভেদেও কোনো কোনো পণ্যের বিক্রয় হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। যেমন: শীতবস্ত্রের চাহিদা শুধু শীতকালে বেশি থাকে। ফলে এই সময়ে এর বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। একজন কাপড় বিক্রেতা যদি শীতবস্ত্র ও গ্রীষ্মকালীন বস্ত্র দুই ধরনের বস্ত্রই তার দোকানে বিক্রয় করেন, তবে ঋতুভিত্তিক পণ্যের চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে মুনাফা অর্জন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এমনিভাবে একটি বইয়ের দোকানে যদি শুধু কবিতার বই বিক্রয় করা হয়, আর পাশাপাশি অন্য একটি দোকানে যদি কবিতার বই, গল্পের বই, ধর্মীয় বই, বিভিন্ন শিক্ষণীয় বই বিক্রয় করা হয়, তবে দেখা যায় ক্রেতারা বই কেনার

২০২৫

জন্য পরের দোকানটিতেই ভিড় করবে। কারণ ক্রেতারা সেখান থেকে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় বই একই সাথে কিনতে পারবে। ঝুঁকি হ্রাসে বৈচিত্র্যায়ণের এই নীতি তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। সেখানে একটি উৎসের বদলে বহুবিধ উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

দলগত কাজ : ব্যবসায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে কোন কোন নীতি গ্রহণ করা উচিত তা ব্যাখ্যা করো।

১.৬ আর্থিক ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি

আর্থিক ব্যবস্থাপকরা দু'ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে :

১। আয় সিদ্ধান্ত বা অর্থায়ন সিদ্ধান্ত

২। ব্যয় সিদ্ধান্ত বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত

আয় সিদ্ধান্ত বা অর্থায়ন সিদ্ধান্ত

আয় সিদ্ধান্ত বলতে মূলত তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অর্থায়ন সিদ্ধান্তের আওতায় তহবিল সংগ্রহের ভিন্ন উৎস নির্বাচন এবং এসব উৎসের সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করে অর্থায়ন-সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সাধারণত চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্পমেয়াদি উৎস থেকে আর স্থায়ী ব্যয় নির্বাহের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত ব্যবসায় তহবিল সংগ্রহে মালিকপক্ষের নিজস্ব পুঁজি ও বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় তহবিল সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া বড় কোম্পানিগুলো শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এই শেয়ারহোল্ডাররাই কোম্পানির মালিক। কোনো প্রতিষ্ঠান ঋণের মাধ্যমে তহবিলের যে অংশ সংগ্রহ করে, তার জন্য প্রতিষ্ঠানটির ঋণের দায় বৃদ্ধি পায়, আবার মালিকপক্ষ হতে সংগৃহীত মূলধনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে মালিকপক্ষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সঠিক অর্থায়ন সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই একটি প্রতিষ্ঠান ঋণের দায় ও মালিকানা স্বত্বের মধ্যে লাভজনক ভারসাম্য সৃষ্টিতে সফল হয়।

ব্যয় সিদ্ধান্ত বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত

একটি দর্জি দোকানের সেলাই মেশিন ক্রয়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। মুদি দোকানের আসবাবপত্র, রেফ্রিজারেটর ক্রয়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদনমুখী মেশিন ক্রয়, কারখানা নির্মাণের খরচও এই জাতীয় সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রত্যাশিত উৎসের আগমন-নির্গমণের একটি পরিকল্পনা করতে হয়। যেমন: প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মেশিন ক্রয়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। যদি মেশিন দ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্যসামগ্রীর বিক্রয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, এতে করে যদি মুনাফা ও নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং সর্বমোট নগদ প্রবাহ যদি মেশিনের ক্রয় মূল্য থেকে বেশি হয়।

অর্থাৎ, মেশিনটি যদি আগামী দশ বছর ব্যবহার করা যাবে মনে হয়, তাহলে মেশিনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটির জন্য আগামী দশ বছরে মালামাল বিক্রয় থেকে যে অর্থের আগমন হবে তার সাথে মেশিনের ক্রয়মূল্যের তুলনা করতে হবে। সুতরাং আগামী দশ বছরে পণ্যের মূল্য কী হবে এবং কী পরিমাণ বিক্রয় হবে তা বিবেচনা করেই কেবল আগামী দশ বছরের বিক্রয়লব্ধ নগদ প্রবাহ বের করা সম্ভব। নগদ প্রবাহ হতে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে উৎপাদন ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে মুনাফা নির্ধারণ করতে হয়।

ফর্মা-২

ভবিষ্যতের পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ও পণ্যের মূল্য নির্ধারণ একটি দুরূহ কাজ বলে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

অন্যান্য সিদ্ধান্ত

উপরিউক্ত দুটি সিদ্ধান্ত আর্থিক ব্যবস্থাপকের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আর্থিক ব্যবস্থাপককে আরো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যেমন–

ক) কী পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী এবং সেই অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করা যাবে– এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে চলতি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলে।

খ) দৈনন্দিন প্রয়োজন নির্বাহ করার জন্য কী পরিমাণ নগদ অর্থ রাখা উচিত, সেটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

গ) যেসব উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে, তাদের প্রাপ্য প্রদান করা আরেকটি সিদ্ধান্ত।

ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য ঋণ যেমন: বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির মাধ্যমে তহবিল সংগৃহীত হলে যথাসময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ প্রদান করার সিদ্ধান্ত আর্থিক ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একইভাবে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিলের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত হারে মুনাফা অর্জন ও লভ্যাংশ বণ্টন আর্থিক ব্যবস্থাপকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

মুক্ত আলোচনা : অর্থায়ন ও বিনিয়োগ – এ দুটি সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ?

ক. ঊর্ধ্বমুখী

খ. বিপরীত

গ. নিম্নমুখী

ঘ. সমানুপাত

২. ব্যবসায়ের অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা হলো–

i. পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ জোগান

ii. কয়েক মাসের জন্য মূলধন খাটানো

iii. অর্থ বণ্টন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শেয়ারের বিনিময়ে বিনিয়োগকারীকে নিয়মিতভাবে কী প্রদান করা হয়?

১০৪ ২. সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য কী?

৩. মুক্তবাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে কীভাবে অর্থায়ন করতে হয়?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

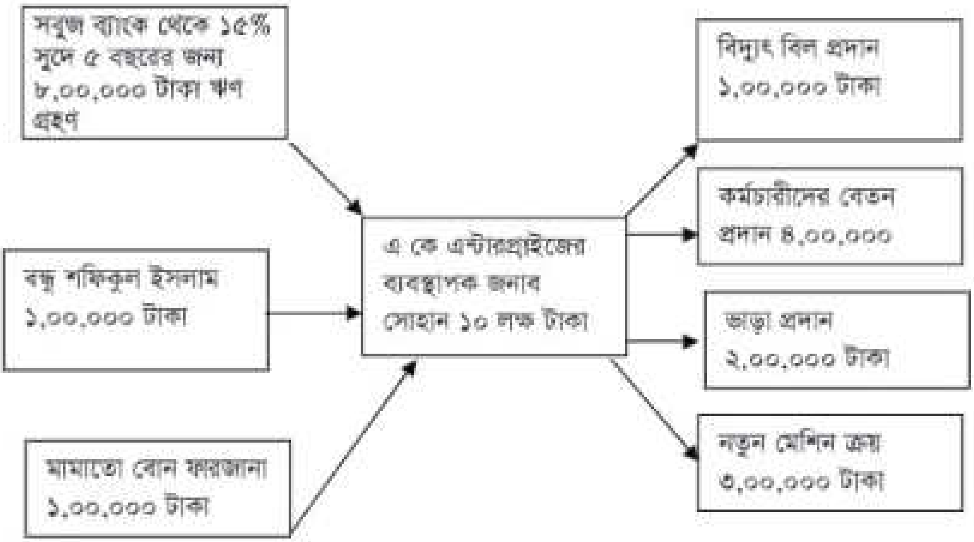

২০১২ সালের আর্থিক বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

ক. বাণিজ্য ঘাটতি কী?

খ. সরকার কেন দেশের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে?

গ. এ কে এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক জনাব সোহানের সামগ্রিক কার্যক্রমকে কী বলা যায়? বর্ণনা কর।

ঘ. জনাব সোহান কোন নীতিটি ঠিকমতো অনুসরণ করলে ক্ষতির সম্মুখীন হতেন না বলে মনে কর?

২.

	ক-প্রতিষ্ঠান	**খ-প্রতিষ্ঠান**
পণ্য–	মিনিপ্যাক শ্যাম্পু	বোতলজাত শ্যাম্পু মিনিপ্যাক শ্যাম্পু হারবাল শ্যাম্পু
মুনাফা/ক্ষতি ভোগকারী–	মালিক একাই	সব মালিকের মধ্যে বণ্টিত হয়

ক. অর্থায়ন কী?

খ. একজন ব্যবসায়ীর কোন ধরনের জ্ঞান থাকলে পরিকল্পনামাফিক স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থসংস্থান করতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

গ. 'ক' প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে অর্থায়ন করতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উপরোউক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানটির ঝুঁকি কম? বিশ্লেষণ করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থায়নের উৎস

Sources of Finance

অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহ, এর ব্যবস্থাপনা ও বণ্টনকে বোঝায়। এই অধ্যায়ে আমরা তহবিল সংগ্রহ করার কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য এর বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। অর্থায়নের বিভিন্ন উৎসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্যবসায়ের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে তহবিল সংগ্রহ করা উচিত। যেমন: স্থায়ী মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রি করে তহবিল সংগ্রহ করা উচিত। আবার দৈনন্দিন প্রয়োজন যেমন: কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য বাকিতে ক্রয়ের সুযোগ ব্যবহার করা উচিত বা স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ নিয়ে তহবিল সংগ্রহ করা উচিত।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- অর্থায়নের উৎস চিহ্নিত করতে পারব।
- অর্থায়নের উৎসের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিভিন্ন মেয়াদি অর্থায়নের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারব।
- স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

২.০ ভূমিকা

যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শুরু করা এবং দৈনন্দিন ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করার জন্য যে তহবিলের প্রয়োজন হয় তার উৎস নির্বাচন অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত। কেননা ভিন্ন ভিন্ন তহবিল উৎসের খরচও ভিন্ন এবং ভিন্ন মেয়াদভিত্তিক তহবিলের সুবিধা-অসুবিধাও আলাদা। বিভিন্ন উৎসের মধ্যে তুলনা করে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিলের উৎসের যে মিশ্রণটি সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদানকারী ও ন্যূনতম খরচযুক্ত, সেই মিশ্রণের উৎস থেকেই প্রতিষ্ঠান তহবিল সংগ্রহ করে। তহবিল বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। উল্লেখ্য যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট পরিচালন ব্যয়ের চেয়ে মোট বিক্রয় আয়ের পরিমাণ বেশি হলে সাধারণত মোট মুনাফা বোঝায়। মোট মুনাফা থেকে তহবিলের উৎস বাবদ খরচ বা ব্যয় ও কর বাদ দিলে নিট মুনাফা পাওয়া যায়। সুতরাং মুনাফার পরিমাণকে সর্বোচ্চকরণে তহবিল উৎসের খরচ ন্যূনতম হওয়া অত্যাবশ্যক।

২.১ বিভিন্ন প্রকার তহবিলের উৎসের ধারণা

ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে ব্যবসায় করার জন্য যে তহবিলের প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করাকে বোঝায়। জনাব রহমান একটি দর্জি দোকানের মালিক। ব্যবসায়ের শুরুতেই তিনি কিছু মেশিন ক্রয় করেন। ব্যবসায়ী সাধারণত তার নিজস্ব সঞ্চয় হতে মেশিন ক্রয়সংক্রান্ত স্থায়ী বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। কেননা এই অর্থ তিনি যেকোনো মেয়াদে ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু তিনি যদি হিসাব করে দেখেন নিজস্ব সঞ্চয় মেশিন ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট নয়, তবে তিনি বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক যেমনঃ জনতা, রূপালী অথবা অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী আর্থিক সংস্থা থেকে নির্দিষ্ট সুদের হারে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করেন। এ ধরনের ঋণ তিনি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গ্রহণ করে থাকেন। ব্যবসায়ীর স্থাবর সম্পত্তি যেমনঃ বিল্ডিং ফ্যাক্টরি, অস্থাবর সম্পত্তি যেমনঃ কাঁচামাল, বিক্রয়যোগ্য মালামাল, ইত্যাদির বিপরীতে ব্যাংক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে বন্ধকী ঋণ গ্রহণ করেও তহবিল সরবরাহ করা যায়। এছাড়া রহমান সাহেব ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জন করেন, তা ব্যবসায় থেকে উত্তোলন না করে ব্যবসায়ে পুনরায় বিনিয়োগ করেও অর্থায়নের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। ব্যবসায় চলাকালীন অবস্থাতেই যদি রহমান সাহেব দৈনন্দিন খরচ যেমনঃ মেশিন মেরামত, বাড়ি ভাড়া প্রদান, কর্মচারীদের বেতন প্রদান, বিদ্যুৎ বিল প্রদান ইত্যাদি নির্বাহের জন্য অর্থ-ঘাটতির মুখোমুখি হন, তবে তা সংস্থানের জন্য তিনি ভবিষ্যৎ বিক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম গ্রহণ করতে পারেন। আবার বাকিতে মালামাল ক্রয় করেও অর্থায়ন করা সম্ভব। অনেক সময় মূল্যবান মেশিনারিজ, বড় ধরনের যন্ত্রপাতি, বিল্ডিং অথবা জমি ইত্যাদি ক্রয় না করে বরং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়াও নেওয়া যায়, এতে ব্যবসায়ী এক সাথে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগের ঝুঁকি হতেও রক্ষা পায়। বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, যেমনঃ কোহিনূর কেমিক্যালস, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, স্কয়ার টেক্সটাইলস, সিঙ্গার বাংলাদেশ–এ ধরনের বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংস্থান করে। এই ধরনের উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারযোগ্য।

এভাবে ব্যবসায়ের গঠন, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে নানারকম উৎস হতে প্রতিষ্ঠান তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তহবিলের দুটি ভিন্ন উৎস থাকে। একটি মালিকপক্ষ অন্যটি ঋণদাতা। মালিকপক্ষের প্রদত্ত তহবিলকে অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ঋণদাতা প্রদত্ত তহবিলকে বহিস্থ উৎস বলা হয়। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই সাধারণত দুটো উৎসই ব্যবহার করে থাকে।

অপর পৃষ্ঠায় ২.১ নং ছকে এ দুটি অর্থায়নের উৎসের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো।

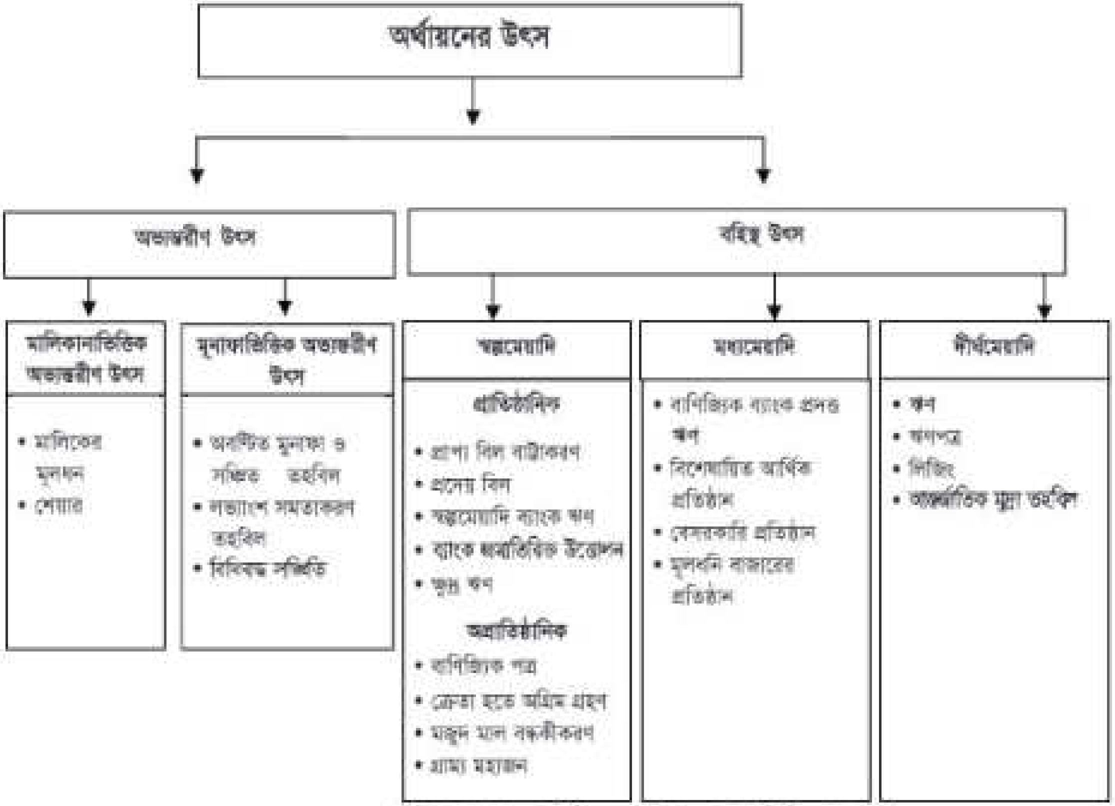

চিত্র নং ২.১: অর্থায়নের উৎসের শ্রেণিবিভাগ

একক কাজ :একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী কোন কোন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

২.২ অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস

ব্যবসায়ের মালিক তার সঞ্চিত মুনাফা বা অব্যবহৃত মুনাফার মাধ্যমে যে তহবিল ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বিনিয়োগ করে তাকেই অভ্যন্তরীণ তহবিল বলা হয়। অভ্যন্তরীণ তহবিল উৎসগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. মালিকানাভিত্তিক খ. মুনাফাভিত্তিক। আমরা এবার এ দুটি উৎসের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানব।

২.২.১ অভ্যন্তরীণ উৎসের মালিকানাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

ভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠনের অভ্যন্তরীণ তহবিলের প্রকৃতিও ভিন্ন হয়। আমরা জানি, সংগঠনের ভিত্তিতে ব্যবসায় একমালিকানা, অংশীদারি বা যৌথমূলধনি প্রতিষ্ঠান হতে পারে। একমালিকানা ব্যবসায়ে এই তহবিলের উৎস মালিকের নিজস্ব অর্থ বা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য যেকোনো উৎপাদনের উপকরণ হতে পারে। যেমন: ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন যা উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি যদি অংশীদারি ব্যবসায় হয়, তাহলে অংশীদারবৃন্দ যে তহবিল ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে তা স্বীয় মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠানটি যদি যৌথমূলধনি ব্যবসায় হয়, সে ক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে যে তহবিল সংগৃহীত হয়, সেটিই ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ তহবিল হিসেবে বিবেচিত হবে। যৌথমূলধনি ব্যবসায় প্রাইভেট লিমিটেড ও পাবলিক লিমিটেড হতে পারে।

প্রাইভেট কোম্পানির উদ্যোক্তার সদস্যসংখ্যা ২ থেকে ৫০ পর্যন্ত হতে পারে আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির উদ্যোক্তার সদস্যসংখ্যা নিম্নে ৭ ও উর্ধ্বে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ যেকোনো সংখ্যক হতে পারে। পাবলিক লিমিটেড বা প্রাইভেট লিমিটেড উভয় কোম্পানিই শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। তবে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি শেয়ারবাজারে শেয়ার বিক্রয় না করে নির্ধারিত মালিকদের মধ্যে বিক্রয় করে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির তহবিল সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো শেয়ার বিক্রয়। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত জানব।

২.২.২. অভ্যন্তরীণ উৎসের মুনাফাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে। এই উপার্জিত আয় থেকে উৎপাদন খরচ, বিক্রয় খরচ ইত্যাদি বাদ দিলে যে অর্থ বাকি থাকে, সেটিই প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত মুনাফা। এই মুনাফা থেকে ঋণের সুদ ও সরকারকে প্রদেয় ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পর বাকিটা বিভিন্নভাবে তহবিলের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়, যা নিচে আলোচনা করা হলো। ঋণের ক্ষেত্রে যেমন কিস্তি পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক অভ্যন্তরীণ উৎস ব্যবহারে বাধ্যতামূলকভাবে তেমন কিছু প্রদান করতে হয় না, ফলে তহবিল পরিশোধের অপারগতা-সংক্রান্ত ঝুঁকি কিছুটা কমে যায়। মুনাফাভিত্তিক কয়েকটি উৎসের সাথে আমরা এখন সংক্ষেপে পরিচিত হব।

ক. অবণ্টিত মুনাফা ও সঞ্চিতি তহবিল

নিট মুনাফার যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন না করে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হয়, তা অবণ্টিত মুনাফা। ভবিষ্যতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করার জন্য এই অবণ্টিত মুনাফা একটি তহবিলে আলাদা করে রাখলে তাকে বলা হয় সঞ্চিতি তহবিল। আবার ভবিষ্যতের কোনো আর্থিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্যও এই সঞ্চিতি তহবিল সৃষ্টি করা যায়।

খ. লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানি থেকে সাধারণত নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। এই লভ্যাংশ প্রদানের সাথে কোম্পানির সুনাম জড়িত। কোনো বছর মুনাফার পরিমাণ কম হলে সে বছর লভ্যাংশ ঘোষণা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এ অবস্থা ব্যবসায়ের সুনামকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে বলে অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে বছর মুনাফা বেশি হয়, সে বছরে নিট মুনাফার একটা অংশ লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিলে সরিয়ে রাখে, যা পরবর্তীতে যখন মুনাফা অপ্রতুল হয়, তখন ব্যবহার করা যায়। এতে প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট হারে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রদান করতে পারে।

একক কাজ : ব্যবসায়ের তহবিল সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহের একটি ছক প্রস্তুত কর।

২.৩ অর্থায়নের বহিস্থ উৎস

বহিস্থ তহবিল বলতে প্রতিষ্ঠানের বাইরের কোনো উৎস, যেমন: ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তহবিল সংগ্রহ করাকে বুঝায়। এটা তহবিল সংগ্রহের একটা জনপ্রিয় উৎস। ব্যাংক ঋণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত ব্যাংক ঋণের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে, উক্ত মেয়াদের মধ্যে ঋণ ব্যবহার করে সুদাসল ফেরত দিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ সুদের হার সুনির্দিষ্ট থাকে, যা দীর্ঘকালব্যাপী পরিবর্তন করা হয় না। তৃতীয়তঃ নিয়মিতভাবে সুদের অর্থ ও কিস্তি পরিশোধ এবং মেয়াদান্তে আসল পরিশোধ করা ব্যবসায়ের জন্য বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়টি যদি লাভজনক নাও হয় তবু এই সকল অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া ব্যাংকের কাছে ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বা বন্ড বিক্রয় করেও একই ধরনের তহবিল সংগ্রহ করা যায়। অগ্রাধিকার শেয়ার বিক্রয় করে তহবিল সংগ্রহ করাও তহবিল সংগ্রহের বহিস্থ উৎস হিসেবে পরিচিত।

তহবিল সংগ্রহের বাহ্যিক উৎসগুলো বেশ জনপ্রিয়। এর দুটি কারণ উল্লেখযোগ্য

১. ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হলে ঋণের সুদ মোট লাভ থেকে প্রদান করার পর যে লাভ অবশিষ্ট থাকে, সেই লাভের উপর কর প্রদান করতে হয়। ফলে প্রদেয় করের পরিমাণ কম হয়।

২. ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থান অনেক সময় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হয়ে যায়, ফলে বহিস্থ অর্থসংস্থানই তহবিল সংগ্রহের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

তবে বহিস্থ তহবিলের একটা অসুবিধা হলো এর সুদ প্রদান বাধ্যতামূলক। আগেও বলা হয়েছে যে ব্যবসায়টি মুনাফা অর্জন করুক বা নাই করুক, ঋণের সুদ ও কিস্তি অবশ্যই প্রদান করতে হবে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করলে এই অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। বহিস্থ তহবিল মেয়াদের ভিত্তিতে সাধারণত ৩ প্রকারঃ ক) স্বল্পমেয়াদি, খ) মধ্যমেয়াদি ও গ) দীর্ঘমেয়াদি। এবার আমরা এই তিন ধরনের অর্থায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

২.৩.১ বহিস্থ অর্থায়নের স্বল্পমেয়াদি উৎস

স্বল্পমেয়াদ বলতে এক বছর বা এক বছরের কম সময়কে বুঝানো হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ অর্থায়ন মূলত স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়, যা এক বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কিছু সুবিধা থাকে। যেমন :

প্রথমত, স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে অর্থ সংস্থানের খরচ তুলনামূলকভাবে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দুইই হতে পারে। যেমনঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণের জন্য স্বল্পমেয়াদে তুলনামূলকভাবে সুদের হার বেশি প্রদান করতে হয়। আবার বিভিন্ন ঋণমুক্ত উৎস যেমনঃ বাকিতে পণ্য ক্রয়, বকেয়া মজুরির মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প সময়ের জন্য অর্থের সংস্থান করতে পারে। যার কোনো মূলধনি খরচ নেই (মূলধনি খরচ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত জানতে পারব)।

দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদি অর্থ আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে দ্রুততম ও সরল প্রক্রিয়া। পক্ষান্তরে, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থ আদান-প্রদানের জন্য অনেক সময় ব্যয় ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়।

তৃতীয়ত, যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা এক বছর সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে, সেসব প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ও অর্থায়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা যায় না। যেমনঃ ফ্যাশন হাউসগুলোর চাহিদার দ্রুত পরিবর্তনশীলতার কারণে পণ্য উৎপাদনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ

করে, ফলে একসাথে কম পরিমাণে উৎপাদন করায় এদের অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণও কম হয়। এ ধরনের ব্যবসায় স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে অর্থসংস্থান করা সুবিধাজনক।

এবার আমরা স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎসগুলো আলোচনা করব। এই মেয়াদের অর্থায়নের উৎসগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এই দুভাগে ভাগ করা যায়। নিচে আমরা প্রথমে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস ও পরে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস আলোচনা করব।

১. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস

ক. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ

যখন বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হয়, তখন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বিক্রেতাকে একটি দলিলের মাধ্যমে এই মর্মে অঙ্গীকার করে যে নির্দিষ্ট মেয়াদ (সাধারণত তিন মাস) শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। এই দলিলকে বিনিময় বিল বলা হয়। বিক্রেতার কাছে এই বিলটি একটি প্রাপ্য বিল। এই ধরনের বিল বাণিজ্যিক ব্যাংকে ভাঙিয়ে বা বাট্টা করে নগদ অর্থ সংগ্রহ করা যায়। ধরা যাক, একজন ক্রেতা জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে ৫০০ টাকার পণ্যদ্রব্য বাকিতে ক্রয় করে বিক্রেতাকে বিনিময় বিল নামক দলিলে এই মর্মে অঙ্গীকার করে যে, সে মার্চ ৩০ তারিখের মধ্যে বিক্রেতাকে বা দলিলের বাহককে ৫০০ টাকা পরিশোধে বাধ্য থাকবে। এ অবস্থায় বিক্রেতার যদি এখনই অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন বিক্রেতা এই বিনিময় বিলটিকে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই যেকোনো ব্যাংকের কাছে বিক্রয় করে বিনিময় বিলের সমমূল্য থেকে কিছু কম যেমন: ৫০০ টাকার বিলে বার্ষিক ৮% বাট্টার হারে ৪৯০ টাকা নগদ সংগ্রহ করতে পারে।

খ. প্রদেয় বিল

উপরের উদাহরণে বিনিময় বিল বিক্রেতার দৃষ্টিতে একটি প্রাপ্য বিল, যা ক্রেতার দৃষ্টিতে প্রদেয় বিল ও একটি স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন কাঁচামাল, উৎপাদনসামগ্রী ইত্যাদি বাকিতে ক্রয় করে, তখন সাময়িক সময়ের জন্য ব্যবসায়ে অর্থসংস্থান হয়। কারণ বাকিতে ক্রয়ের সুবিধা না পেলে নগদে পণ্য ক্রয় করতে অর্থের প্রয়োজন হতো, যার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে সুদসহ ফেরত দিতে হতো।

গ. স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ

স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণ একটি প্রধান উৎস। এ ধরনের ব্যাংক ঋণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন: সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ আসল একসাথে পরিশোধ করা হয়। অনেক সময় ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ঋণের আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে মোট পরিমাণের উপর কিছু ছাড় প্রদান করে। যেমন: একজন ঋণগ্রহীতার ৬ মাস পর প্রদেয় ৬০০০ টাকা মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই পরিশোধ করার জন্য যদি ব্যাংক তাকে মোট টাকার ২% ছাড় দেয় তাহলে ঋণগ্রহীতা ব্যাংককে ৫,৮৮০ টাকা প্রদান করবে। এছাড়া ঋণগ্রহীতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার না করে ব্যাংক চাওয়া মাত্রই ঋণ

পরিশোধের শর্তে ঋণ গ্রহণ করে, তবে সেটিকে চাহিবামাত্র প্রদেয় ঋণ বলা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের বিকল্প উৎস আছে তারা স্বল্প খরচে এই উৎস ব্যবহার করতে পারে।

ঘ. ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন

স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের আর একটি উৎস ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন। সব প্রতিষ্ঠানই মূলত চলতি হিসাবের মাধ্যমে পাওনা আদায় ও দেনা পরিশোধ করে থাকে। এ ধরনের ব্যাংকে হিসাব সাধারণত মক্কেলকে বা প্রতিষ্ঠানকে জমার অতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে, তবে জমার অতিরিক্ত উত্তোলনের সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যাংক সীমাবদ্ধ করে দেয়। সাধারণত যেসব প্রতিষ্ঠানে বছরের কিছু সময়ে বিক্রয় কমে যায়, সেই সময়ে এ ধরনের উৎস থেকে অর্থায়ন একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরি সারা বছর তার উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যে অর্থব্যয় করে কিন্তু মূলত গ্রীষ্মকালে আইসক্রিম বিক্রি বেশি হয়, ফলে বছরের অন্যান্য সময়ে অর্থায়নের জন্য এই উৎসটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণের সুদ প্রদান করতে হয়, কিন্তু এ ধরনের ঋণের সুদ শুধু যখন থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ ব্যবহার করা হয়, কেবল তখন থেকেই সুদ দিতে হয়। তবে এ ধরনের ঋণের সুদের হার অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে বেশি এবং এটি ব্যাংক চাওয়ামাত্রই ঋণগ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হয়।

ঙ. ক্ষুদ্র ঋণ

এ ধরনের ঋণ সাধারণত কৃষিনির্ভর ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে প্রদান করা হয়। যেমনঃ কুটির শিল্প ব্যবস্থাপনা, কৃষি উপাদান ক্রয়, হ্যাচারি বা খামার পরিচালনা ইত্যাদি। গ্রামীণ ব্যাংক, যুব উন্নয়ন ব্যাংক, সমবায় ব্যাংকগুলো এ ধরনের ঋণ প্রদান করে থাকে। এই ঋণগুলো ধাপে ধাপে উদ্দেশ্য অর্জনের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

২. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস

ক. বাণিজ্যিক পত্র

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে লাভসহ আসল অর্থ ফেরত প্রদানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে এই বাণিজ্যিক পত্র (Commercial Paper) বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাণিজ্যিক পত্র বিক্রয়ে জামানত হিসাবে কাজ করে। সাধারণত যে সকল ব্যক্তির সাময়িক সময়ের জন্য কিছু অব্যবহার্য অর্থ থাকে, তারা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের বিকল্প হিসাবে এই বাণিজ্যিক পত্র ক্রয় করে। সাধারণত খ্যাতিমান ব্যক্তি, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিমা কোম্পানি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক পত্র বিক্রয় করে সাময়িক সময়ের জন্য অর্থায়ন করতে পারে।

খ. ক্রেতা হতে অগ্রিম গ্রহণ

অনেক সময় বিশ্বস্ত ও স্থায়ী ক্রেতারা ভবিষ্যৎ ক্রয়ের মোট মূল্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক অগ্রিম প্রদান করে ফলে বিক্রেতা সাময়িক সময়ের জন্য অর্থ সংস্থান করতে পারে।

গ. মজুত পণ্য বন্ধকীকরণ

স্বল্পমেয়াদি অর্থ সংস্থানের জন্য মজুতপণ্য ব্যবহার করা যায়। কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ সংস্থানের জন্য কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে তার মজুতপণ্য জামানত বা বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করাকে মজুত পণ্যের মাধ্যমে অর্থসংস্থান বলা হয়। এ ধরনের অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে সুদসহ ঋণের অর্থ ফেরত না দেয়া পর্যন্ত মজুতপণ্যের উপর ঋণদাতার নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার বজায় থাকে।

ঘ. গ্রাম্য মহাজন

বহুকাল পূর্ব থেকেই গ্রামের বিত্তশালী ব্যক্তিরা স্বল্পমেয়াদে দরিদ্র ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান করে আসছে। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে বড় অংকের সুদ প্রদান করতে হয়। আর সুদসহ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে মহাজনরা ঋণগ্রহীতাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নেয়। গ্রাম্য মহাজনরা এ ঋণের উপরে দিনভিত্তিক, সপ্তাহভিত্তিক অথবা মাসভিত্তিক সুদ গণনা করে থাকেন।

২.৪ বহিস্থ অর্থায়নের মধ্যমেয়াদি উৎস

এক বছরের উর্ধ্বে এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য সংগৃহীত তহবিল মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন হিসেবে পরিগণিত। একটি প্রতিষ্ঠান মধ্যমেয়াদি তহবিল ব্যবহার করে ব্যবসায়ের চলমান মূলধনের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজন মিটায়। এই তহবিলের খরচ বা সুদের হার স্বল্পমেয়াদি তহবিলের খরচ হতে বেশি এবং দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের খরচ হতে কম হয়। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যভেদে এর উৎস আলোচনা করা হলো :

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রদত্ত ঋণ

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেসব ঋণ মধ্যম মেয়াদের জন্য প্রদান করে, তা সাধারণত জামানতের বিপরীতে দেওয়া হয়। জামানত হিসাবে চলতি সম্পদ অথবা স্থায়ী সম্পত্তি ও ব্যবহারযোগ্য। একটি প্রকল্পে বেশি পরিমাণে ঋণ প্রদান একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ফলে বেশি পরিমাণে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক একত্রিত হয়ে সিন্ডিকেশন প্রক্রিয়ায় দলগত ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে বড় আকারের ঋণ প্রদানের ঝুঁকি গ্রহণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণ প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত সুদের হার ও ঋণের চাহিদা বিচার-বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য করে।

খ. বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সাধারণত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে বিশেষ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়, যেগুলো বিশেষ বিশেষ খাতের উন্নয়নের স্বার্থে নিয়োজিত থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক শর্তে মধ্যমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ. বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে বেশ কিছু এনজিও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও কর্মরত আছে, যেগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মধ্যমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। যেমন: মাইডাস, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান

এনজিও হিসেবে আইনগত সত্তা লাভ করে এখানে ব্যবসায় করছে। এসব প্রতিষ্ঠান তহবিল প্রদান ছাড়াও পরামর্শ দান, প্রশিক্ষণ দান, দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি ব্যাপারেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে থাকে।

ঘ. মূলধনি বাজারের প্রতিষ্ঠান

বিভিন্ন প্রকার মূলধনি প্রতিষ্ঠান যেমনঃ বিমা প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ ব্যাংক, অর্থ মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (অবলেখক) ও মধ্যমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

২.৫ বহিস্থ অর্থায়নের দীর্ঘমেয়াদি উৎস

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মেয়াদ হচ্ছে ৫ বছরের থেকে ঊর্ধ্বে যেকোনো সময়কাল পর্যন্ত। দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎসগুলোর বিশেষ কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা এবার এই বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করব। প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিলের আকার সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি উৎসের তুলনায় বড় হয়, ফলে এই তহবিল বিভিন্ন স্থায়ী সম্পত্তি যেমনঃ ভূমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো পরিশোধ পদ্ধতি-সংক্রান্ত। দীর্ঘমেয়াদি তহবিল ঋণের মাধ্যমে গৃহীত হলে তা চুক্তি মোতাবেক পরিশোধ করতে হয়। আর যদি শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়, তবে তা মালিকের তহবিল হিসাবে বিবেচিত হয় বলে ব্যবসায় বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পরিশোধের প্রয়োজন হয় না। একমালিকানা ও অংশীদারি কারবারে মালিকের নিজস্ব মূলধনও সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যবহার করা যায়। তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো আয়কর সংক্রান্ত। শেয়ারের লভ্যাংশে করযোগ্য কিন্তু ঋণপত্রের সুদ করযোগ্য নয়। এ কারণে শেয়ার ক্রয় করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করলে যে খরচ হয়, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিলে অপেক্ষাকৃত কম খরচ হয়। এবার আমরা দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস আলোচনা করব।

ক. ঋণ

যেকোনো প্রতিষ্ঠান সাধারণত মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্রয়, সরঞ্জাম ক্রয়, দালান-কোঠা নির্মাণ, জমি ক্রয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বড় অংকের অর্থ দীর্ঘসময়ের জন্য জামানতের বিপরীতে ঋণ নিয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠানের আয়, সুনাম, স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ, অতীত ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ বিষয়ক তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেওয়া হয় স্থায়ী বিনিয়োগের জন্য। যেমনঃ ব্যবসায়ের পরিসর বৃদ্ধি, কারখানা নির্মাণ, বিল্ডিং নির্মাণ, বড় আকারের যন্ত্রাদি ক্রয় ইত্যাদি। এই সকল বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি প্রাক্কলন করে, যা Capital Budgeting নামে পরিচিত। সেখানে উক্ত বিনিয়োগ থেকে ভবিষ্যতে যে লাভ-ক্ষতি হবে তার পর্যালোচনা করা হয়। লাভ-ক্ষতির এই প্রাক্কলন বিবেচনা করে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সন্তুষ্ট হলেই ঋণ দেওয়া হয়।

খ. ঋণপত্র

ঋণপত্র বা Debenture-এর ক্ষেত্রে বড় অঙ্কের ঋণ কেটে ছোট ছোট খণ্ডে বিক্রয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। এটি শেয়ারের একটি বিকল্প। কিন্তু ঋণপত্রে একটি সুদের হার উল্লেখ থাকে যে হারে

ঋণগ্রহীতা সুদ দিতে বাধ্য থাকে। প্রতিষ্ঠানের মুনাফা না হলেও সবার আগে ব্যবসায়টি ঋণদাতাদের পাওনা (সুদ) পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থায়নে মূল সুবিধা হলো দীর্ঘমেয়াদে এর সুদের হার স্থির ও পূর্ব নির্ধারিত থাকে বলে আর্থিক ব্যবস্থাপকরা দক্ষতার সাথে অর্থায়ন পরিকল্পনা করতে পারে।

গ. লিজিং

লিজিং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের একটি আধুনিক পদ্ধতি। একটি প্রতিষ্ঠানের যদি ব্যয়বহুল সম্পত্তি যেমনঃ মেশিন, সরঞ্জাম, যানবাহন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, তখন সেগুলো সরাসরি ক্রয় করতে হয় অথবা সরাসরি ক্রয় না করে লিজের মাধ্যমে লিজিং কোম্পানি থেকে ভাড়া নিয়েও ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে কোম্পানি সম্পত্তিটির মালিকানা পায় না। সম্পত্তিটির মালিক লিজিং কোম্পানি। লিজ নেওয়ার জন্য লিজিং কোম্পানিকে নির্দিষ্ট হারে ভাড়া (সুদের মতো) প্রদানের বিনিময়ে লিজকৃত সম্পত্তি ব্যবহার করার অধিকার অর্জিত হয়। ধরা যাক, একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি ফটোকপি মেশিন ক্রয় না করে ৬ বছরের জন্য একটি লিজিং কোম্পানি থেকে ভাড়া প্রদানের ভিত্তিতে লিজ নেয় এবং মেয়াদান্তে ফটোকপি মেশিনটি আবার লিজিং কোম্পানির কাছে ফেরত দেয়। অর্থাৎ লিজিং এর ফলে সম্পত্তির মালিকানা লিজিং কোম্পানির কাছে থাকে। লিজিংয়ের ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেওয়া প্রয়োজন হয় না অথবা সঞ্চিত তহবিলও ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এই কারণে লিজিং একটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস। নতুন অথবা ছোট প্রতিষ্ঠান যাদের মূলধনের পরিমাণ কম থাকে, সেসব প্রতিষ্ঠানও লিজিংয়ের মাধ্যমে ব্যয়বহুল মেশিন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। লিজিং কোম্পানি লিজকৃত সম্পত্তির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

ঘ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

এটি একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৯ (সর্বশেষ সদস্য হলো Republic of Nauru)। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে এই সংস্থা সাহায্য করে থাকে। এর প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত।

২.৬ উৎস নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থের প্রয়োজন মিটাবার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে। উৎস নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎসের মধ্যে সুবিধা-অসুবিধা বিচার-বিশ্লেষণ, তহবিল সংগ্রহের খরচ, প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, তহবিলের প্রয়োজনের ধরন ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিবেচনা করা প্রয়োজন। তহবিল উৎসের সঠিক মিশ্রণ সৃষ্টি অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সঠিক তহবিল উৎস নির্বাচনে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত সেগুলো মূলত :

ক. ব্যবসায়ের ধরন

একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত নিজস্ব সঞ্চয়, ব্যবসায়ের মুনাফা, আত্মীয়স্বজন থেকে গৃহীত ঋণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। বড় আকারের তহবিলের ক্ষেত্রে লিজিংও একটি উপযুক্ত অর্থায়নের উৎস। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এগুলো ছাড়া শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করেই বেশির ভাগ তহবিল সংগ্রহ করা হয়। ২.১ নং চিত্রটির মাধ্যমে ব্যবসায়ের গঠন ও উদ্দেশ্যভেদে অর্থায়ন উৎসের একটি মিশ্রণ কাঠামো দেওয়া হলো।

চিত্রে প্রথম লাইনে আমরা দেখছি, সঞ্চয় উৎসটি একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের জন্য উপযোগী। এরপর দেখা যাচ্ছে অবণ্টিত মুনাফা, জমাতিরিক্ত উত্তোলন, স্বল্পমেয়াদি ঋণ ও লিজিং সব ধরনের সংগঠনের জন্যই গ্রহণযোগ্য। তবে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও শেয়ার ইস্যু শুধু কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

	একমালিকানা ব্যবসায়	অংশীদারি ব্যবসায়	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
সঞ্চয়	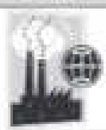	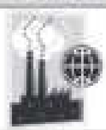		
অবণ্টিত মুনাফা	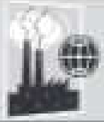	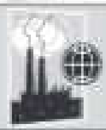		
জমাতিরিক্ত উত্তোলন	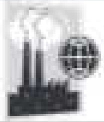	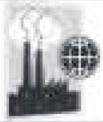	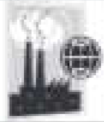	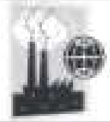
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	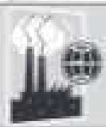	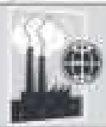	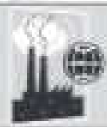	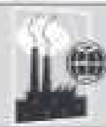
লিজিং	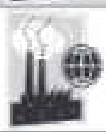	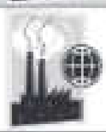	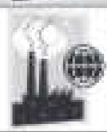	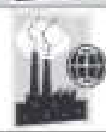
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ/বন্ধক			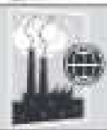	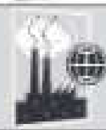
শেয়ার ইস্যু			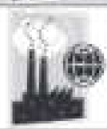	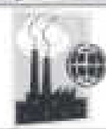

চিত্র ২.১: ব্যবসায় সংগঠন ভেদে অর্থায়নের উৎস নির্বাচন

খ. জামানতযোগ্য সম্পত্তির অপ্রতুলতা

সাধারণত নতুন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদ জামানতের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ সম্ভব হয় না। কেননা প্রাথমিক অবস্থায় জামানতযোগ্য স্থায়ী সম্পদ থাকে না। আবার নতুন কোম্পানির জন্য শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ও অনেকটা অনিশ্চিত থাকে। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের প্রয়োজন হলে লিজিংয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা অধিকতর যুক্তিসংগত।

গ. অর্থায়নের প্রয়োজনের ধরন

প্রতিষ্ঠান যদি মূল্যবান যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, জমি, দালান-কোঠা ইত্যাদি ক্রয় করতে চায়, তবে দীর্ঘমেয়াদি উৎস যেমন: শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইস্যু, লিজ গ্রহণ, জামানতের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি উৎস

ব্যবহার ফলপ্রসূ হয়। যদি প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল ক্রয়, মজুরি প্রদান, বাড়িভাড়া প্রদান ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের ঘাটতি হয়, তবে বাকিতে ক্রয়, প্রাপ্য বিল জামানত, ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন ইত্যাদি উৎসের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা যায়।

ঘ. তহবিল উৎসের খরচ

অনেক রকম উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠান তহবিল ব্যবহার হতে অর্জিত আয় ও তহবিলের সংগ্রহের খরচের মধ্যে তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধার বিচার-বিশ্লেষণ করে সেই উৎস থেকেই তহবিল সংগ্রহ করে, যার খরচ ন্যূনতম। ধরা যাক, একটি প্রতিষ্ঠান তার কার্য পরিচালনার জন্য একটি কারখানা ক্রয় করতে চায়। ফলে তহবিল সংগ্রহে প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার ইস্যু করে। কিন্তু শেয়ারের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করতে হয়, যা এ উৎসটির খরচ। আবার প্রতিষ্ঠানটি নতুন কারখানা ক্রয়ের জন্য সম্পত্তি বন্ধকের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সুদসহ কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। ফলে এ উৎসটিও অনেক ব্যয়বহুল। এ দুটির মধ্যে যেটির খরচ ন্যূনতম, সেই উৎসটি প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করতে পারে। অথবা দুটি উৎসের মধ্যে লাভজনক মিশ্রণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। শেয়ারের লভ্যাংশ কর যোগ্য কিন্তু ঋণপত্রের সুদ করযোগ্য নয়। সুতরাং করের বোঝা লাঘব করার জন্য ব্যাংক বা অন্যান্য উৎস থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হতে অধিকতর শ্রেয়। অনেক ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট উৎস ব্যবহারের চেয়ে উৎসের মিশ্রণে সুবিধা বেশি পাওয়া যায় এবং খরচও কমানো সম্ভব হয়।

ঙ. তহবিল উৎসের ঝুঁকি

যদি কোনো প্রতিষ্ঠান জামানতযুক্ত ঋণ গ্রহণ করে, তবে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে সম্পত্তি জামানত হিসাবে রাখতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানটি জামানতকৃত সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। ফলে তহবিলের উৎস নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট উৎসের আনুষঙ্গিক ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করতে হয়।

দলগত কাজ : ব্যবসায় সংগঠনের ধরন অনুযায়ী তহবিল উৎসের একটি তালিকা তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মধ্যমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস কোনটি?

ক. ক্ষুদ্র ঋণ

খ. বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

গ. ক্রেতা থেকে অগ্রিম গ্রহণ

ঘ. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ

২. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সমস্যা দূরীকরণে উৎস নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়–

i. মূলধন সংগ্রহের ব্যয়

ii. মূলধনের গুরুত্ব ও লক্ষ্য

iii. বিভিন্ন ধরনের উপকারিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

পোশাকশিল্প ব্যবসায়ী জনাব বজলুর রহমান তার নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাত বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছেন।

৩. জনাব বজলুর রহমান তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন উৎসের সহায়তা নিয়েছেন?

ক. ক্রেতা হতে অগ্রিম গ্রহণ

খ. লিজিং

গ. ঋণপত্র

ঘ. বাণিজ্যিক পত্র

৪. জনাব বজলুর রহমান তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিহার করেছেন–

i. সঞ্চিতি তহবিল ব্যবহার

ii. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ

iii. বাধ্যতামূলক সুদ প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থ আদান-প্রদানের দ্রুততম ও সরল প্রক্রিয়া কোনটি?

২. এক থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য সংগৃহীত তহবিল কোন ধরনের অর্থায়ন তা ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দীর্ঘদিন ধরে জামদানি ব্যবসায় নিয়োজিত দীননাথ চক্রবর্তী মাঝে মাঝে বিভিন্ন উৎস থেকে অল্প সময়ের জন্য অর্থের সংস্থান করতেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি তার ব্যবসায় প্রসার করে এতৎসঙ্গে তাঁতবস্ত্রেরও ব্যবসায় শুরু করতে মনস্থির করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি নারায়ণগঞ্জে একটি পুরাতন ফ্যাক্টরি ১০০টি মেশিনসহ দীর্ঘ ১০ বছরের জন্য নেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন।

ক. অর্থায়নের উৎসকে মূলত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

খ. ব্যবসায় সম্প্রসারণে সঞ্চিতি তহবিলের ভূমিকাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. বর্তমানে দীননাথ চক্রবর্তী সাধারণত ব্যবসাক্ষেত্রে কোন ধরনের তহবিলের সহায়তায় আর্থিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন?

ঘ. ব্যবসায় সম্প্রসারণে আর্থিক সহায়তাকল্পে দীননাথ চক্রবর্তীর অন্যান্য উৎসেরও শরণাপন্ন হতে হবে– উক্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. জনাব মোঃ শফিক লেখাপড়া করতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে তিনি চামড়াশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসায় করতে উৎসাহিত হয়। আর্থিক সমস্যা নিরসনে তিনি সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হন।

ক. অর্থ আদান-প্রদানের সবচেয়ে দ্রুততম ও সরল প্রক্রিয়া কোনটি?

খ. কোন অর্থায়ন এক থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য সংগৃহীত তহবিল হিসেবে গণ্য হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. জনাব শফিককে সাহায্যকারী সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? বর্ণনা করো।

ঘ. জনাব শফিকের মতো যুবসমাজকে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কী ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার

Share, Bond and Debenture

কোম্পানির ইস্যুকৃত শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার অর্থায়নের দীর্ঘমেয়াদি উৎস এবং একই সাথে বিনিয়োগকারীদের জন্য এক একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। বিনিয়োগের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত এসব পদ্ধতির প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। এসব বিনিয়োগ পদ্ধতি থেকে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত আয় এবং ঝুঁকিতে ভিন্নতা থাকে। ফলে একজন বিনিয়োগকারীকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে প্রত্যেকটি পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা দরকার। এ অধ্যায়ে আমরা বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে এসব বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চারের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকারের শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।
- বন্ড ও ডিবেঞ্চারের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারব।
- লভ্যাংশ নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৩.১ ভূমিকা

অর্থায়নের উৎস হিসেবে কোম্পানির ইস্যুকৃত সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের খাত হিসেবে বিবেচিত হয়। একজন বিনিয়োগকারী বিভিন্ন খাতে তার অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। মনে কর, তোমার বাবার ১০ লক্ষ টাকা আছে। এই দশ লক্ষ টাকা তিনি ইচ্ছে করলে কোনো ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখতে পারে অথবা তিনি উক্ত টাকা দিয়ে কোনো কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড এবং ডিবেঞ্চার এদের যেকোনো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে। বিনিয়োগের খাত হিসেবে এদের প্রত্যেকটির নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে। এদের প্রতিটি থেকে বিনিয়োগকারীর আয় এবং ঝুঁকিতে ভিন্নতা রয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে বিনিয়োগের খাত হিসেবে এদের প্রতিটির স্বকীয়তা, সুবিধা-অসুবিধা এবং তুলনামূলক বিচার আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২ শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ

পাবলিক লি. কোম্পানির তহবিল বা মূলধন সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে শেয়ার বিক্রয়। শেয়ার হচ্ছে বড় অঙ্কের মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য কোম্পানি সংগঠনগুলো বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের প্রচলন করে থাকে।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

৩.২.১ সাধারণ শেয়ার

বড় অঙ্কের মোট মূলধনকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করে শেয়ার হিসেবে বিক্রয় করা হয়। সরকারের অনুমতি নিয়ে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের পর সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিবরণপত্র ছাপিয়ে কোম্পানিটি সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়ে জনগণের নিকট শেয়ার ক্রয়ের আবেদন চাওয়া হয়। অনেক আবেদন পড়লে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বণ্টন করা হয়। ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরাও শেয়ার কিনে বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করতে পারে। এরাই প্রকৃত পক্ষে কোম্পানির মালিক। প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টিত হয়। তারপরের প্রয়োজন পড়লে শেয়ারহোল্ডাররা সেকেন্ডারি মার্কেটে (যেমন: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ) তাদের শেয়ার বিক্রয় করতে পারে এবং সেখানে মূল্য বৃদ্ধি পেলে তাদের লাভ হয়। সাধারণত লাভজনক কোম্পানির ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। তবে লভ্যাংশ প্রদানের কোনো নির্দিষ্ট হার পূর্বনির্ধারিত থাকে না। কোম্পানির জন্য লভ্যাংশ প্রদান করা বাধ্যতামূলকও নয়। মুনাফা না হলে সাধারণত লভ্যাংশ প্রদান করা হয় না। মুনাফা হলেও সম্পূর্ণ অংকের মুনাফা লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করা হয় না। কোম্পানি ইচ্ছে করলে যেকোনো হারে লভ্যাংশ প্রদান করতে পারে, আবার লভ্যাংশ নাও প্রদান করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করতে না পারলে সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়, যা কোম্পানির জন্য ভালো নয়।

বিনিয়োগকারীদের জন্য শেয়ার ক্রয় একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানি সবসময় শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ দিতে বাধ্য থাকে না। কোনো বছর কোম্পানি পর্যাপ্ত মুনাফা করতে না পারলে শেয়ার মালিকদের কোনো লভ্যাংশ দেওয়া হয় না। আবার কোম্পানির অবসায়নকালে সম্পত্তি বিক্রি হতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে সকল পাওনাদার এবং অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের দাবি মেটানোর পর সাধারণ শেয়ার মালিকদের দাবি মেটানো হয়। ফলে সব দাবি মেটানোর পর কোনো অবশিষ্ট অর্থ না থাকলে সাধারণ শেয়ার মালিকরা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিবর্তে কিছুই না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এসব কারণে সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ বিধায় এরকম শেয়ার থেকে আয়ের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। বুঝে-শুনে বিনিয়োগ করলে সাধারণ শেয়ার একজন বিনিয়োগকারীর জন্য একটি ভালো বিনিয়োগ উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বিনিয়োগের খাত হিসেবে সাধারণ শেয়ারের কিছু স্বকীয়তা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো:

ক. সাধারণ শেয়ার বিনিয়োগকারীকে কোম্পানির মালিকানা দেয়। ফলে কোম্পানির মালিক হিসেবে এর অর্জিত লাভ এবং সম্পত্তির উপর আইনগত অধিকার থাকে।

খ. সাধারণ শেয়ার এর মালিকদের কোম্পানি নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়। শেয়ার মালিকরা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গ. সাধারণ শেয়ার সহজে হস্তান্তরযোগ্য। বিনিয়োগকারী ইচ্ছে করলে যেকোনো সময় তার ধারণকৃত শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে।

বিনিয়োগের খাত হিসেবে সাধারণ শেয়ারের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। যেমন–

সুবিধা

ক. অধিক আয় : বুঝে-শুনে বিনিয়োগ করলে সাধারণ শেয়ার একজন বিনিয়োগকারীর জন্য ভালো আয়ের উৎস হতে পারে। বিনিয়োগের অন্যান্য খাত যেমন: অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার থেকে বিনিয়োগকারীর প্রাপ্ত আয় নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু সাধারণ শেয়ার থেকে আয় নির্দিষ্ট থাকে না। ফলে কোম্পানি অধিক আয় করলে বিনিয়োগকারীদের প্রাপ্ত আয়ও বৃদ্ধি পায়।

খ. সীমাবদ্ধ দায় : সাধারণ শেয়ার মালিকরা যৌথভাবে কোম্পানির ঝুঁকি বহন করে। কোনো অবস্থাতেই একজন বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি তার বিনিয়োগকৃত অর্থের অধিক হয় না। উদাহরণস্বরূপ, মনে করো একজন বিনিয়োগকারী কোনো কোম্পানির ১০ টাকা মূল্যের ১০০টি শেয়ার ক্রয় করেন, ফলে তার দায় সর্বোচ্চ $১০ \times ১০০ = ১,০০০$ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

গ. তারল্য : সাধারণ শেয়ার বিনিয়োগকারীর কাছে তরল সম্পদ হিসেবে সমাদৃত। বিনিয়োগকারী যেকোনো সময় ইচ্ছে করলে তার ধারণকৃত শেয়ার বিক্রি করে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারে। তবে সব কোম্পানির শেয়ারের তারল্যতা সমান হয় না। সাধারণত বড় এবং ভালো কোম্পানির শেয়ারের তারল্য অন্য কোম্পানিগুলোর চেয়ে বেশি হয়।

অসুবিধা

ক. ঝুঁকি : সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। শেয়ারবাজারে অনেক ফটকা বিনিয়োগকারী থাকে, ফলে বুঝে-শুনে বিনিয়োগ না করলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

খ. **মুনাফা ও সম্পত্তি বণ্টনে অধিকার :** কোম্পানি মুনাফা বণ্টনে সবার দায় তথা অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড ও ঋণপত্র মালিকদের প্রাপ্য আয় পরিশোধের পর অবশিষ্ট মুনাফার উপর সাধারণ শেয়ার মালিকদের অধিকার থাকে। অনুরূপভাবে কোম্পানির অবসায়নকালে সম্পত্তি বিক্রির প্রাপ্ত অর্থ থেকে কোম্পানির সব দায় পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট অর্থ শেয়ার মালিকরা ভাগাভাগি করে নেয়। অর্থাৎ, উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড ও ঋণপত্র মালিকদের দাবি সাধারণ শেয়ার মালিকদের দাবি থেকে অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩.২.২ অগ্রাধিকার শেয়ার

যেসব বিনিয়োগকারী শেয়ারে বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে আয় প্রত্যাশা করে, তাদের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার একটি ভালো বিনিয়োগ খাত হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে আমাদের দেশে অগ্রাধিকার শেয়ারের সংখ্যা খুব বেশি দেখা যায় না। সাধারণ শেয়ারের ন্যায় অগ্রাধিকার শেয়ারের নিজস্ব কিছু স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ক. **মালিকানা :** অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের কোম্পানির পুরোপুরি মালিক বলা হয় না। তাদেরকে সাধারণ শেয়ার মালিক এবং বন্ড ও ঋণপত্র মালিকদের মাঝামাঝি অবস্থানে বিবেচনা করা হয়।

খ. **রূপান্তরযোগ্যতা :** অনেক অগ্রাধিকার শেয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় পর সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করার বিকল্প সুযোগ থাকে। ফলে বিনিয়োগকারী ইচ্ছে করলে এই সুযোগ ব্যবহার করে সাধারণ শেয়ার মালিক হতে পারে।

বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রাধিকার শেয়ারের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে অগ্রাধিকার শেয়ারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো :

সুবিধা

ক. **নির্দিষ্ট হারে আয় :** অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকরা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায়। ফলে শেয়ার মালিকদের আয়ের অনিশ্চয়তা কম থাকে।

খ. **মুনাফা/আয়ের উপর অগ্রাধিকার :** লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকরা সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ প্রদানের আগে অগ্রাধিকার পায়।

গ. **সম্পদের উপর দাবি :** কোম্পানির অবসায়ন বা বিলুপ্তির সময় সম্পদের উপর অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের দাবি সাধারণ শেয়ার মালিকদের দাবির পূর্বে বিবেচনা করা হয়। তবে অবশ্যই ঋণপত্র মালিকদের দাবির পর তাদের দাবি পূরণ করা হয়।

অসুবিধা

ক. **নিয়ন্ত্রণ :** অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের কোনো ভোটাধিকার থাকে না। ফলে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের কোম্পানির উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

খ. **সীমিত আয় :** অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের আয় হার নির্দিষ্ট থাকে। ফলে কোম্পানি অতিরিক্ত মুনাফা করলে ও অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকরা এর কোনো অংশ পায় না।

কাজ : একজন বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করো।

৩.২.৩ বিলম্বিত শেয়ার

যে শেয়ার ক্রয় করলে শেয়ার মালিকগণ অন্যান্য সকল প্রকার শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ প্রদানের পর আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ পায় অর্থাৎ বিলম্বে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে তাকে বিলম্বিত শেয়ার বলে। কোম্পানি অবসায়নের ক্ষেত্রে এ শেয়ার হোল্ডারদের দাবি সকলের পরে মিটানো হয়। সাধারণত কোম্পানির প্রবর্তকগণ এ ধরনের শেয়ার ক্রয় করে থাকে। তাই এ ধরনের শেয়ারকে প্রবর্তকের শেয়ার বলেও অভিহিত করা হয়।

৩.২.৪ রাইট শেয়ার

কোম্পানি গঠনের পরবর্তী সময়ে শেয়ার বিক্রয় করার ক্ষেত্রে যখন পুরাতন শেয়ার মালিকগণ ঐ শেয়ার ক্রয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে তাকে রাইট শেয়ার বলে। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজনে শেয়ার বিক্রয় করা হলে পুরাতন শেয়ার মালিকগণ যখন ঐ শেয়ার ক্রয়ের অধিকার সংরক্ষণ করেন তখন ঐ বিক্রয়যোগ্য শেয়ারকে রাইট শেয়ার বলা হয়ে থাকে।

৩.২.৫ বোনাস শেয়ার

কোনো কোম্পানির অবন্টিত মুনাফা যখন শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন না করে অবন্টিত মুনাফা শেয়ারে রূপান্তর করে পুরাতন শেয়ার মালিকদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করা হয়, তখন এ ধরনের শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বলে।

৩.৩ বন্ড

বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের আরেকটি খাত হচ্ছে বন্ড। পূর্বেই জেনেছ যে দলিল বা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের থেকে ঋণ মূলধন সংস্থান করে সেটিকে বন্ড বলা হয়। দেশে অধিকাংশ কোম্পানি ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে ঋণ মূলধনের সংস্থান করে। ফলে বিনিয়োগের খাত হিসেবে বন্ড এখনও আমাদের দেশে খুব বেশি পরিচিতি পায়নি।

বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ডের কিছু আলাদা স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

ক. **জামানত :** বন্ডের বিপরীতে কোম্পানি সাধারণত স্থায়ী সম্পত্তি বা দলিলপত্রাদি জামানত হিসেবে রাখে। ফলে কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের পাওনা পরিশোধ করতে না পারলে এসব সম্পত্তি বিক্রি করে বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ আদায় করতে পারে।

খ. **পরিপক্বতার তারিখ :** কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডের একটি নির্দিষ্ট পরিপক্বতার তারিখ থাকে। উক্ত পরিপক্বতার তারিখে বিনিয়োগকারী বন্ডে উল্লিখিত লিখিত মূল্য ফেরত পায়।

গ. **ঋণদাতা :** বন্ড মালিকরা কোম্পানির ঋণদাতা হিসেবে গণ্য হয়। ফলে তাদের কোনো ভোটাধিকার থাকে না।

ঘ. **রূপান্তরযোগ্যতা :** কোম্পানি অনেক সময় বিনিয়োগকারীদের কাছে রূপান্তরযোগ্য বন্ড বিক্রি করে থাকে। এক্ষেত্রে বন্ড মালিকরা ইচ্ছে করলে বন্ডে উল্লিখিত শর্ত অনুসারে তাদের ধারণকৃত বন্ডকে নির্দিষ্টসংখ্যক সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করতে পারে।

সুবিধা

ক. **সুদের হার :** সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে বিধায় বন্ডে বিনিয়োগকারীদের আয় নির্দিষ্ট থাকে। ফলে তাদের আয়ে অনিশ্চয়তা কম থাকে। তবে কোনো কোনো সময় সুদের হার পরিবর্তনশীলও হতে পারে।

খ. **ঝুঁকি কম :** বন্ডের বিপরীতে স্থায়ী বা অন্যান্য সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখা হয় বিধায় বন্ডে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

গ. **মুনাফা এবং সম্পদের উপর অধিকার :** কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত আয় থেকে সর্বপ্রথম বন্ড মালিকদের সুদ প্রদান করা হয়। অন্যদিকে কোম্পানি বিলুপ্তি বা অবসায়নকালে সম্পদ বিক্রির প্রাপ্ত অর্থ থেকে সর্বপ্রথম বন্ড মালিকদের পাওনা টাকা পরিশোধ করে অন্যদের দাবি পূরণ করা হয়। অর্থাৎ বন্ড মালিকদের দাবি সাধারণ এবং অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের দাবি থেকে অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

অসুবিধা

ক. **কম আয় হার :** সাধারণ শেয়ার এবং অগ্রাধিকার শেয়ারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বন্ড মালিকদের আয় হার কম হয়।

খ. **নিয়ন্ত্রণ :** অগ্রাধিকার শেয়ারের ন্যায় বন্ড মালিকদের ভোটাধিকার থাকে না বিধায় বন্ড মালিকরা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

৩.৪ ডিবেঞ্চার

ডিবেঞ্চার হচ্ছে একটি জামানতবিহীন বন্ড। ফলে বন্ডের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য ডিবেঞ্চারে বিদ্যমান। বন্ড ও অগ্রাধিকার শেয়ারের ন্যায় ডিবেঞ্চারও আমাদের দেশে খুব বেশি দেখা যায় না।

বন্ডের তুলনায় এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ডিবেঞ্চারের বিপরীতে কোনো জামানত থাকে না। ডিবেঞ্চারের বিপরীতে জামানত থাকে না বিধায় সব কোম্পানির ডিবেঞ্চার বিনিয়োগকারীরা ক্রয় করে না। বিনিয়োগকারীরা সাধারণত বড় স্বনামধন্য কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে।

ডিবেঞ্চারের সুবিধা ও অসুবিধা

বিনিয়োগের খাত হিসেবে ডিবেঞ্চারের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নরূপ :

সুবিধা

ক. **নিয়মিত আয় :** বন্ডের ন্যায় বিনিয়োগকারীরা ডিবেঞ্চার থেকে নির্দিষ্ট হারে নিয়মিত আয় পায়।

খ. **নির্দিষ্ট সময় :** ডিবেঞ্চারের নির্দিষ্ট মেয়াদের কারণে অনেক বিনিয়োগকারীর কাছে এটি জনপ্রিয়।

অসুবিধা

ক. জামানতহীনতা : ডিবেঞ্চারের বিপরীতে কোনো জামানত থাকে না বিধায় এটি ঝুঁকিপূর্ণ।

খ. নিয়ন্ত্রণ : বন্ডের ন্যায় ডিবেঞ্চার মালিকদের ভোটাধিকার থাকে না। ফলে কোম্পানির পরিচালনায় ডিবেঞ্চার মালিকদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

গ. মুনাফা ও সম্পদে অধিকার : ডিবেঞ্চার মালিকরা সাধারণ পাওনাদারদের সমান মর্যাদা ভোগ করে। ফলে কোম্পানির অর্জিত আয় থেকে ডিবেঞ্চার মালিকদের সুদ দেওয়ার আগে বন্ড মালিকদের সুদ পরিশোধ করা হয়। অনুরূপভাবে কোম্পানির বিলুপ্তির সময় বা অবসায়নকালে বন্ড মালিকদের দাবি বা পাওনা পরিশোধের পর ডিবেঞ্চার মালিকদের পাওনা পরিশোধ করা হয়।

একক কাজ : একজন বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের জন্য বন্ড ও ডিবেঞ্চারের কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করো।

৩.৫ বাংলাদেশের শেয়ারবাজার

যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে শেয়ারবাজার মূলধন সংগ্রহের বাজার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য সাধারণ জনগণ বা বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা থাকে শেয়ারবাজার যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার ক্রমশ উন্নতি সাধন করেছে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। অতএব, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে বিনিয়োগ করা উচিত নয়। এতে লাভের সাথে সাথে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের পূর্বে কোম্পানিগুলোর বার্ষিক আর্থিক বিবরণী সংগ্রহ করে কোম্পানির বিভিন্ন তথ্য যেমন: শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস), ব্যবসায়ের ধরন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা, নিট সম্পদ মূল্যসহ (এনএভি) অন্যান্য আর্থিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি শিল্প খাত এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রয়োজনে বাজার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া যায়। তবে কোনো অবস্থাতেই গুজবের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য থেকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানি এবং বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। এরূপ প্রতিষ্ঠানকে স্টক এক্সচেঞ্জ বলা হয়। স্টক এক্সচেঞ্জ নামক প্রতিষ্ঠান সাধারণ জনগণ বা প্রতিষ্ঠান থেকে কোম্পানিকে তহবিল সংস্থানে সাহায্য করে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের একটি নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশে দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে।

১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

উল্লিখিত দুটি এক্সচেঞ্জে বিভিন্ন কোম্পানির সাধারণ শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চার এবং বন্ড ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়। বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুবিধার্থে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারগুলোকে এ,বি, জি, এন এবং জেড ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

সাধারণত শেয়ারবাজারের গতি বা সার্বিক অবস্থা বোঝায় জন্য সূচক ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে :

ক. ডিএসই প্রশস্ত সূচক (DSE Broad Index)

খ. ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক (DSE Shariah Index)

গ. ডিএসই ৩০ সূচক (DSE 30 Index) এবং

ঘ. ডিএসই CDSET Index নামে চারটি সূচক ব্যবহার করা হয়।

অনুরূপভাবে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে :

ক. সিএসই সকল শেয়ারমূল্য সূচক (CSE All Shares Price Index)

খ. সিএসইএসসি সূচক (CSE Selective Categories Index) এবং

গ. সিএসই ৩০ সূচক (CSE 30 Index) নামে তিনটি সূচক প্রচলিত আছে।

শেয়ারবাজারের সূচক প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ওঠানামা করে। এসব ওঠানামা বাজারের গতি বা দিক সম্পর্কে তথ্য দেয়। এ সূচকের ওঠানামা শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ারমূল্য ওঠানামার উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়লে সূচক বাড়ে, আবার অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম কমলে সূচক কমে।

৩.৬ শেয়ারে বিনিয়োগ পদ্ধতি

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীরা দুটি উপায়ে বিনিয়োগ করতে পারে। যথা :

ক. প্রাথমিক বাজারের (Primary Market) মাধ্যমে।

খ. সেকেন্ডারি বাজারের (Secondary Market) মাধ্যমে।

ক. **প্রাথমিক বাজার :** প্রাথমিক বাজার বলতে কোম্পানি যে বাজারে শেয়ার বিক্রির প্রথম প্রস্তাব (Initial Public Offering) করে, সে বাজারকে বোঝায়। কোনো কোম্পানি প্রথমবারের মতো বাজারে শেয়ার বিক্রি করলে সেটিকে শেয়ার বিক্রির প্রথম প্রস্তাব বলা হয়। একজন বিনিয়োগকারী কোনো কোম্পানির শেয়ার বিক্রির প্রথম প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করে শেয়ার ক্রয় করলে, সে প্রাথমিক বাজারে শেয়ার ক্রয় করেছে বলে মনে করা হয়।

খ. **সেকেন্ডারি বাজার :** কোম্পানি কর্তৃক প্রথমবার বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ার বিক্রির পর বিনিয়োগকারীরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। যে বাজারে বিনিয়োগকারীরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে, সে বাজারকে সেকেন্ডারি বাজার বলা হয়।

৩.৭ লভ্যাংশ ও লভ্যাংশ নীতি

একটি কোম্পানির অর্জিত লাভ বা মুনাফা শেয়ার মালিকদের প্রাপ্য আয়। ফলে অর্জিত লাভ বা মুনাফা শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। সাধারণত কোম্পানি অর্জিত লাভ বা মুনাফার পুরো অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করে না। লাভ বা মুনাফার একটি অংশ ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের কাজে অর্থায়নের জন্য

সংরক্ষণ করে এবং বাকি অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করে। লাভ বা মুনাফার যে অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, সে অংশকে লভ্যাংশ বলা হয়। কোম্পানি সাধারণত দুইভাবে লভ্যাংশ দিতে পারে।

ক. নগদ লভ্যাংশ

খ. স্টক লভ্যাংশ বা বোনাস শেয়ার

ক. নগদ লভ্যাংশ : যে লভ্যাংশ নগদ টাকায় পরিশোধ করা হয়, সে লভ্যাংশকে নগদ লভ্যাংশ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ: মনে কর, একটি কোম্পানি ১০% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে। একজন শেয়ার মালিক ঐ কোম্পানির ১০ টাকা মূল্যের ৫০০ শেয়ার ধারণ করে। উক্ত ব্যক্তি নগদ লভ্যাংশ হিসেবে ৫,০০০×১০% টাকা বা ৫০০ টাকা পাবে।

খ. স্টক লভ্যাংশ : কোম্পানি অনেক সময় নগদ লভ্যাংশের পরিবর্তে স্টক লভ্যাংশ বা নগদ লভ্যাংশের পাশাপাশি স্টক লভ্যাংশ দিয়ে থাকে। কোম্পানি সাধারণত বর্তমানে ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর আনুপাতিক হারে স্টক লভ্যাংশ দিয়ে থাকে। ফলে কোম্পানির শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মনে করো, একটি কোম্পানির বর্তমানে ১০ টাকা মূল্যের ১ কোটি শেয়ার আছে। কোম্পানি ৫০ শতাংশ বা ২:১ অনুপাতে স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করে। ফলে কোনো বিনিয়োগকারীর বর্তমানে ৫০০টি শেয়ার থাকলে স্টক লভ্যাংশ পাবার পর শেয়ার সংখ্যা ৭৫০টি হবে। অনুরূপভাবে কোম্পানির মোট ইস্যুকৃত শেয়ার ১.৫ কোটি হবে।

লভ্যাংশ নীতি

কোম্পানিকে প্রতিবছর লভ্যাংশ-সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেমন: অর্জিত লাভের কত অংশ লভ্যাংশ দেওয়া হবে, নগদ লভ্যাংশ না স্টক লভ্যাংশ দেওয়া হবে ইত্যাদি। এসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রতিটি কোম্পানির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকে, যা কোম্পানিকে লভ্যাংশ প্রদানে দিকনির্দেশনা দিতে পারে। এসব নীতিমালাকে লভ্যাংশ নীতি বলে। সাধারণত তিন প্রকার লভ্যাংশ নীতি পরিলক্ষিত হয়। যথা–

ক. স্থিতিশীল টাকা লভ্যাংশ নীতি : এ নীতি অনুযায়ী প্রতিবছর অর্জিত লাভ থেকে সমপরিমাণ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ: একটি কোম্পানি প্রতিবছর শেয়ারপ্রতি ১০ টাকা লভ্যাংশ দিলে এটিকে স্থিতিশীল লভ্যাংশ নীতি বলা হবে। শেয়ারপ্রতি আয় যত বেশি হোক না কেন, কোম্পানি গত বছরগুলোতে প্রদত্ত লভ্যাংশের সমপরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করে। তবে এ পদ্ধতিতে সাধারণত লভ্যাংশের পরিমাণ কমে না।

খ. লভ্যাংশ প্রদান অনুপাত নীতি : এ নীতি অনুযায়ী কোম্পানি প্রতিবছর অর্জিত মুনাফার কত অংশ লভ্যাংশ প্রদান করবে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানি প্রতিবছর আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করো, কোনো কোম্পানি অর্জিত মুনাফার ৫০% লভ্যাংশ প্রদানের আনুপাতিক হার হিসেবে নির্ধারণ করে। ফলে কোনো বছর যদি কোম্পানির অর্জিত মুনাফা ২ কোটি টাকা হয়, তাহলে কোম্পানি লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার মালিকদের ২ কোটি × ৫০% বা ১ কোটি টাকা প্রদান করবে।

গ. স্থির লভ্যাংশ সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ নীতি : যেসব কোম্পানির আয় স্থিতিশীল বা নিয়মিত নয়, সেসব কোম্পানির জন্য এটি একটি আদর্শ লভ্যাংশ নীতি। এ নীতি অনুযায়ী কোম্পানি প্রতিবছর ন্যূনতম স্থিতিশীল লভ্যাংশের সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ প্রদান করে। অন্যান্য লভ্যাংশ নীতির তুলনায় এটি অনেক নমনীয় বিধায় অনেক কোম্পানি এই লভ্যাংশ নীতি অনুসরণ করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের উৎস হলো–

i. শেয়ার
ii. বন্ড
iii. ডিবেঞ্চার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　গ. ii ও iii
খ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

২. অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের অসুবিধা কোনটি?

ক. মুনাফার উপর অগ্রাধিকার　　গ. সীমিত আয়
খ. সীমাবদ্ধ দায়　　ঘ. নির্দিষ্ট হারে আয়

৩. স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারগুলো কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

ক. ২　　গ. ৪
খ. ৩　　ঘ ৫

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

জনাব হাবিব 'বান্ধব' কোম্পানির প্রথমবারের মতো শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দেখে আকৃষ্ট হয়ে তা ক্রয় করেন। কয়েক বছর পর তার আর্থিক সংকট দেখা দিলে তিনি তা বিক্রি করতে বাজারে যেতে চাচ্ছেন।

৪. জনাব হাবিব 'বান্ধব' কোম্পানির শেয়ার কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন?

ক. কোম্পানির প্রধান অফিস　　খ. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
গ. প্রাথমিক বাজার　　ঘ. সেকেন্ডারি বাজার

৫. শেয়ার বিক্রির জন্য জনাব হাবিবের কোন বাজার যুক্তিসংগত হবে?

ক. কোম্পানির প্রধান অফিস　　খ. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
গ. প্রাথমিক বাজার　　ঘ. সেকেন্ডারি বাজার

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন লভ্যাংশ নীতিতে আয়ের কম অংশ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়?

২. মুনাফার একটি অংশ ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের কোন ধরনের কাজের জন্য সংরক্ষিত থাকে?

৩. শেয়ারবাজারের সার্বিক অবস্থা বোঝার জন্য কী ব্যবহার করা হয়।

৪. শেয়ারবাজার যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে কোন ধরনের বাজার হিসাবে ভূমিকা রাখে?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শাহীনুর সরকারি চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর কয়েক লক্ষ টাকা হাতে পান। তিনি এই অর্থ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে চান। তিনি এমন বিনিয়োগকারী হতে চান যেন তাকে সুদ পেতে না হয় এবং কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাই তিনি 'সূর্যোদয়' ও 'সৈকত' কোম্পানির বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করছেন।

ক. ডিবেঞ্চার মালিকরা কাদের সমান মর্যাদা ভোগ করেন?

খ. কোন ধরনের লভ্যাংশ প্রদান করলে কোম্পানির শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে? ব্যাখ্যা করো।

গ. শাহীনুর 'সূর্যোদয়' ও 'সৈকত' কোম্পানির কোন তথ্য বিশ্লেষণ করছেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কোন ধরনের বিনিয়োগকারী হওয়া শাহীনুরের জন্য যুক্তিযুক্ত হবে বলে তুমি মনে কর। মতামত দাও।

২. A & Z কোম্পানি তাদের জমি জনাব খবির হোসেনের কাছে জামানত হিসেবে রেখে ২ কোটি টাকা ঋণ মূলধন সংগ্রহ করে। খবির হোসেনের সাথে কোম্পানির যে চুক্তি হয়েছে তাতে অর্থ ফেরত পাওয়ার তারিখ ২০১৯ সালে ১ জানুয়ারি উল্লেখ আছে। হঠাৎ কোম্পানিটি ২০১৮ সালের জুন মাসে বিলুপ্ত হবে বলে ঘোষণা আসে। তাতে তিনি বিচলিত হননি।

ক. শেয়ার মালিকদের প্রাপ্য আয় কী?

খ. যেসব কোম্পানির আয় স্থিতিশীল নয়, তারা কেন স্থির লভ্যাংশের সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ নীতি অনুসরণ করে? ব্যাখ্যা

গ. A & Z কোম্পানি অর্থায়নের জন্য কোন কৌশলটি বেছে নিয়েছে? বর্ণনা করো।

ঘ. A & Z কোম্পানি বিলুপ্ত হওয়া বা না হওয়া উভয় ক্ষেত্রে খবির হোসেনের বিনিয়োগের নিরাপত্তাটি মূল্যায়ন করো।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থের সময়মূল্য

Time Value of Money

অর্থায়নের বেশির ভাগ সিদ্ধান্তের মূলে অর্থের সময়মূল্যের ধারণাটি জড়িত। এখনকার ১০০ টাকা আর ১০ বছর পরের ১০০ টাকা সমান মূল্য বহন করে না। অর্থের সময়মূল্যের এই ধারণা আমাদের দৈনন্দিন অর্থায়নেও প্রয়োজন। গ্রামীণ মহাজন থেকে যদি অর্থ ঋণ নেওয়া হয়, তখন সে কী হারে সুদ হিসাব করে, এটা জানা থাকলে আমরা অন্যান্য উৎসের সাথে তুলনা করে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উৎস বের করে অর্থায়ন করতে পারব। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য, বর্তমান মূল্য ও প্রকৃত সুদের হার কীভাবে নির্ধারণ করা হয় তা আমরা এই অধ্যায়ে শিখব। এই অধ্যায়ের অংক করতে আমাদের প্রত্যেকের সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর লাগবে।

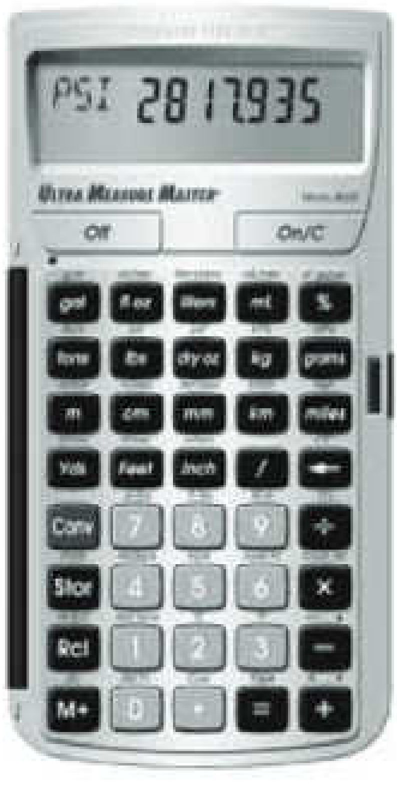

ছবি: ক্যালকুলেটর

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- অর্থের সময় মূল্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অর্থের বর্তমান মূল্য ও ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করার পদ্ধতির অনুশীলন করতে পারব।

৪.১ অর্থের সময়মূল্যের ধারণা

ফিন্যান্সের দৃষ্টিতে সময়ের সাথে সাথে অর্থের মূল্য পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ এখনকার ১০০ টাকা আর পাঁচ বছর পরের ১০০ টাকা সমান মূল্য বহন করে না, এখনকার ১০০ টাকা অধিকতর মূল্যবান। এটাই অর্থের সময়মূল্য ধারণা। অর্থের সময়মূল্যের মূল কারণ সুদের হার। মনে কর, তুমি তোমার বন্ধুর কাছে ১০০ টাকা পাও, এমতাবস্থায় সে বলল ১০০ টাকা এখন না পরিশোধ করে ১ বছর পর পরিশোধ করবে। অর্থের সময়মূল্য বলে যে এখনকার ১০০ টাকা আর এক বছর পরের ১০০ টাকা সমান মূল্য বহন করে না। ধরা যাক, সুদের হার শতকরা ১০ ভাগ অর্থাৎ তুমি যদি সোনালী ব্যাংকে এখন ১০০ টাকা জমা রাখো, তবে আগামী বছর ব্যাংক তোমাকে ১১০ টাকা দেবে। সুতরাং এখনকার ১০০ টাকা এবং আগামী বছরের ১১০ টাকা অর্থের সময়মূল্য অনুযায়ী সমান মূল্য বহন করে।

৪.২ অর্থের সময়মূল্যের গুরুত্ব

ব্যবসায়ের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সাথেই অর্থের আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ জড়িত থাকে। সাধারণত পণ্যদ্রব্য ও সেবা বিক্রয় হতে অর্থের যে প্রবাহ ঘটে তাকে আন্তঃপ্রবাহ বলে এবং কাঁচামাল ক্রয়, মজুরি প্রদান এবং অন্যান্য পরিচালন ব্যয়ের জন্য অর্থের যে প্রবাহ ঘটে তাকে বহিঃপ্রবাহ বলে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের মেয়াদভিত্তিক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ফলে অর্থের সময়মূল্যের গুরুত্ব বিবেচনায় বলা যায়–

ক. সুযোগ ব্যয় নির্ধারণ : কোনো একটি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করলে অন্য কোনো প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগকে ত্যাগ করতে হয়। যে বিনিয়োগ সুযোগ ত্যাগ করা হয় তা থেকে প্রত্যাশিত আয়কে বিনিয়োগের সুযোগ ব্যয় বলে। অর্থের সময়মূল্যের সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে এই সুযোগ ব্যয় নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তোমার এলাকায় জমির মূল্য ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়। পক্ষান্তরে সোনালী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে সুদের হার ধরা যাক শতকরা ৮ ভাগ। জমি কিনলে সোনালী ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে না, তাই জমি ক্রয়ের সুযোগ ব্যয় এ ক্ষেত্রে ৮%। এ ক্ষেত্রে আমরা এই অধ্যায়ের সূত্র নং ১ ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে জমি কেনা উচিত, নাকি সোনালী ব্যাংকে টাকা রাখা উচিত। এ ব্যাপারে একটি সহজ এবং মোটামুটি সঠিক পদ্ধতি 'রুল ৭২' নামে পরিচিত। টাকা বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে দ্বিগুণ হলে ৭২-কে মেয়াদ দিয়ে ভাগ করলে সুদের হার পাওয়া যায়, আবার ৭২-কে সুদের হার দিয়ে ভাগ করলে মেয়াদ পাওয়া যায়। জমির মূল্য যেহেতু ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়। সুতরাং সুদের হার (৭২/১০)% বা ৭.২%। সুতরাং জমি ক্রয় না করে সোনালী ব্যাংকে টাকা রাখা যুক্তিসংগত।

খ. প্রকল্প মূল্যায়ন : দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প মূল্যায়নে প্রকল্পের বর্তমান ব্যয়ের সাথে ভবিষ্যৎ আয়ের মধ্যে তুলনা করতে হয়। এই অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, টাকার বর্তমান মূল্য ও ভবিষ্যৎ মূল্য সমান নয়। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আয়কে বর্তমান মূল্যে না এনে আমরা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প মূল্যায়ন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। পরবর্তী অধ্যায়ে ক্যাপিটাল বাজেটিং করার সময় আমরা এই ধারণার প্রয়োগ দেখব।

গ. ঋণগ্রহণ সিদ্ধান্ত : ব্যাংক বা যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের আগে কিস্তি পরিশোধের ক্ষমতা বিবেচনা করতে হয়। ঋণ পরিশোধের বিভিন্ন মেয়াদের ভিত্তিতে কিস্তির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন: ৫ বছর মেয়াদি অথবা ৮ বছর মেয়াদি ঋণের কিস্তি ভিন্ন হবে, আবার কিস্তি বার্ষিক অথবা মাসিক হতে পারে। সে ক্ষেত্রেও কিস্তির পরিমাণ ভিন্ন হবে। অর্থের সময়মূল্য নির্ণয় করে আমরা বিভিন্ন

পরিমাণ ঋণের বিভিন্ন মেয়াদি কিস্তি বের করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে কী ধরনের মেয়াদে কীভাবে পরিশোধ্য কিস্তিতে কত টাকা ঋণ নেওয়া ব্যবসায়টির জন্য উপযুক্ত হবে। এ ধরনের পরিকল্পনার অভাবে অনেক ব্যবসায় দেউলিয়া হয়ে যায়, কারণ ঋণ গ্রহণের আগে পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করে তবে ঋণ নিতে হয়। মনে রাখতে হবে, ঋণের টাকা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক, পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যবসায়টি দেউলিয়া হয়ে যায়।

৪.৩ অর্থের সময়মূল্যের সূত্র

পূর্বের উদাহরণে আমরা জেনেছি যে সুদের হার শতকরা ১০ ভাগ হলে এখনকার ১০০ টাকা, আগামী বছরের ১১০ টাকার সমান মূল্য বহন করে। এই ১০০ টাকাকে বলা হয় বর্তমান মূল্য এবং ১১০ টাকাকে বলা হয় ভবিষ্যৎ মূল্য।

৪.৩.১ ভবিষ্যৎ মূল্য ও বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি

বর্তমান মূল্য জানা থাকলে ১নং সূত্র ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ মূল্য বের করা যায়।

সূত্র-১ : ভবিষ্যৎ মূল্য (FV) = বর্তমান মূল্য $(১+ \text{সুদের হার})^{\text{বাৎসরিক মেয়াদ}}$

বা, $FV = PV (১+i)^n$

এখানে FV হচ্ছে Future Value এবং PV হচ্ছে Present value

বর্তমানের ১০০ টাকার ১ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য	$= ১০০ (১+০.১০)^১$
	$= ১০০ \times ১.১০$
	= ১১০ টাকা
বর্তমানের ১০০ টাকার ২ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য	$= ১০০ (১+০.১০)^২$
	$= ১০০ \times ১.২১$
	= ১২১ টাকা

ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণের জন্য উপরোক্ত উদাহরণে যে প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে বলা হয় চক্রবৃদ্ধিকরণ পদ্ধতি। এখানে লক্ষণীয় যে, এক বছর পরে ১১০ টাকা ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে আসল ১০০ টাকা ও সুদ ১০% হারে ১০ টাকা। একইভাবে দ্বিতীয় বছর আরও ১০ টাকা সুদ হলে দ্বিতীয় বছরে ভবিষ্যৎ মূল্য হওয়া উচিত ১২০ টাকা কিন্তু দ্বিতীয় বছরের ভবিষ্যৎ মূল্য হয়েছে ১২১ টাকা। এর কারণ দ্বিতীয় বছরের শুরুতে আসল ধরা হয় ১১০ টাকা এবং তাতে করে দ্বিতীয় বছরে ১০% হারে সুদ হয় ১১ টাকা। এভাবে প্রথম বছরের সুদাসলকে দ্বিতীয় বছরের আসল ধরে তার উপর দ্বিতীয় বছরের সুদ ধার্য করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় চক্রবৃদ্ধিকরণ পদ্ধতি। চক্রবৃদ্ধিকরণ পদ্ধতিতে প্রতিবছর সুদাসলের উপর সুদ ধার্য করে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ সুদ আসলের উপর যে সুদ প্রদান করা হয় তাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়। কিন্তু সরল সুদের ক্ষেত্রে কেবল আসলের উপর সুদ গণনা করা হয়।

কাজ : চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সরল সুদের ধারণা ব্যবহার করে ১২% সুদে ১,০০০ টাকার ৫ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো।

৪.৩.২ বর্তমান মূল্য ও বার্ষিক বাট্টাকরণ

ভবিষ্যৎ মূল্য জানা থাকলে ২নং সূত্র অনুযায়ী বর্তমান মূল্য নির্ণয় করা যায়। ১নং সূত্রে যে উপাদানটি দিয়ে গুণ করা হয়েছিল, এখানে তা দিয়ে ভাগ করা হবে। এটাকে বলা হয় বাট্টাকরণ প্রক্রিয়া।

সূত্র নং ২ : $$\text{বর্তমান মূল্য (PV)} = \frac{\text{ভবিষ্যৎ মূল্য}}{(১ + \text{সুদের হার})^{\text{বাৎসরিক মেয়াদ}}} \quad \text{বা,} \quad PV = \frac{FV}{(১+i)^n}$$

যেমন : ১ বছর পরের ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য (PV) $= \dfrac{১০০}{(১+.১০)^১}$

$= ৯০.৯১$ টাকা

বর্তমান মূল্য নির্ধারণের জন্য উপরোক্ত উদাহরণটিতে বাট্টাকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। বাট্টাকরণ পদ্ধতিতেও ঠিক বিপরীতভাবে প্রতিবছর ভবিষ্যৎ সুদাসলকে সুদের হার দিয়ে ভাগ করে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং, তোমার বন্ধু যদি ১ বছর পর ১০০ টাকা দেয়, তবে তার ঐ টাকার বর্তমান মূল্য হলো ৯০.৯১ টাকা। সাধারণত সুদের হারের কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে অর্থের মূল্যের পার্থক্য ঘটে।

কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে চক্রবৃদ্ধি ও বাট্টাকরণ পদ্ধতির ব্যবহার করে এককালীন অর্থপ্রবাহের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করা হলো:

উদাহরণ-১ : শতকরা ১০% হারে বর্তমান ১০০ টাকার ৫ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য কত হবে?

সূত্র : ১ অনুযায়ী :

এখানে, বর্তমান মূল্য (PV) = ১০০ টাকা (PV=Present Value)

সুদের হার (i) = ১০%

মেয়াদকাল (n) = ৫ বছর

ভবিষ্যৎ মূল্য (FV) = কত?

$$FV = PV\,(১ + i)^n$$

সূত্রে মান বসিয়ে,

$$FV = ১০০(১+.১০)^৫$$
$$= ১০০ \times (১.১০)^৫$$
$$= ১০০ \times ১.৬১$$
$$= ১৬১ \text{ টাকা}$$

ধারণা : বর্তমানে ১০০ টাকার যে মূল্য, সুদের হার ১০% হলে ৫ বছর পরের ১৬১ টাকার সমান মূল্য বহন করে।

উদাহরণ-২ : সুদের হার ১০% হলে ৫ বছর পরের ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য কত? সূত্র নং ২ ব্যবহার করে আমরা বর্তমান মূল্য বের করব।

এখানে, ভবিষ্যৎ মূল্য (FV) $= ১০০$ টাকা

সুদের হার (i) $= ১০\%$

মেয়াদ (n) $= ৫$ বছর

অতএব, বর্তমান মূল্য (PV) $= \dfrac{FV}{(১+i)^n}$

সূত্রে মান বসিয়ে, $PV = \dfrac{১০০}{(১+০.১০)^৫}$

$= \dfrac{১০০}{(১.১০)^৫}$

$= ৬২.০৯$ টাকা।

ধারণা : ৫ বছর পরের ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য প্রায় ৬২ টাকা। সুতরাং তোমার বন্ধু যদি ১০০ টাকা এখন পরিশোধ না করে ৫ বছর পরে পরিশোধ করে, তাহলে বর্তমান মূল্য অনুযায়ী তোমার ক্ষতি হয় (১০০-৬২)= ৩৮ টাকা।

সুদের হার ২০% হলে ৫ বছর পরের ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য (PV) $= \dfrac{১০০}{(১+০.২০)^৫}$

$= \dfrac{১০০}{(১.২০)^৫}$

$= ৪০.১৮৭$ টাকা।

এখানে লক্ষণীয় সুদের হার ১০% হতে ২০% অর্থাৎ দ্বিগুণ হলেও ৫ বছর পরের ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য ৬২ টাকা হতে কমে অর্ধেক হবে না। অর্থাৎ সুদের হারের সাথে অর্থের সময় মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কটি সমানুপাতিক নয়।

৪.৩.৩ বছরে একাধিকবার চক্রবৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ

উপরের উদাহরণে ধরে নেওয়া হয়েছে যে বছরে একবার চক্রবৃদ্ধি হবে কিন্তু কখনো কখনো বছরে একাধিকবার চক্রবৃদ্ধি হতে পারে। যেমন : ব্যাংকে টাকা রাখলে যদি মাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ বছরে ১২ বার চক্রবৃদ্ধি হয়। সেক্ষেত্রে সূত্রটিতে দুটি পরিবর্তন করতে হবে। বছরে যদি ১২ বার চক্রবৃদ্ধি হয়, তাহলে প্রথমত সুদের হারকে ১২ দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত মেয়াদকেও ১২ দিয়ে গুণ করতে হবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে সূত্রটির প্রয়োগ দেখানো হলো।

উদাহরণ-৩: যদি তুমি ১০% চক্রবৃদ্ধি সুদে ১০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখ এবং তুমি জানো বছরে ১২ বার চক্রবৃদ্ধি হবে, তবে ১ বছর পর তুমি কত টাকা পাবে? এর সমাধানের জন্য তোমাকে নিচের সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে।

সূত্র ৩: $FV = PV\left(১+\dfrac{i}{m}\right)^{(n \times m)}$

এখানে, বর্তমান মূল্য (PV) = ১০০ টাকা
সুদের হার (i) = ১০%
বছরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা (m) = ১২
বছরের সংখ্যা (n) = ১ বছর
ভবিষ্যৎ মূল্য (FV) = কত ?

সূত্রে মান বসিয়ে, $FV = ১০০\,(১+\frac{০.১০}{১২})^{১\times১২}$

$= ১১০.৪৭$ টাকা।

ধারণা: যদি তুমি আজকে ১০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখো তাহলে ১ বছর পরে তুমি ১১০.৪৭ টাকা পাবে। অর্থাৎ তুমি ১১০.৪৭ - ১০০ = ১০.৪৭ টাকা বেশি পাবে।

উদাহরণ-৪: শতকরা ১৩.৫% হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে ৫০,০০০ টাকা ব্যাংকে এখন জমা রাখলে ১০ বছর পরে কত টাকা পাওয়া যাবে?

$$FV = PV\left(১+\frac{i}{m}\right)^{(n\times m)}$$

এখানে, বর্তমান মূল্য (PV) = ৫০,০০০ টাকা
সুদের হার (i) = ১৩.৫% বা ০.১৩৫
বছরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা (m) = ১২
বছরের সংখ্যা (n) = ১০ বছর
ভবিষ্যৎ মূল্য (FV) = কত?

সূত্রে মান বসিয়ে, $FV = ৫০০০০\,(১+\frac{০.১৩৫}{১২})^{১০\times১২}$

$= ৫০০০০\times(১.০১১২৫)^{১২০}$

$= ১,৯১,৪২৩.০২$ টাকা।

ধারণা : সুতরাং এখনকার ৫০,০০০ টাকা এবং উক্ত পলিসির ১০ বছর পরের ১,৯১,৪২৩.০২ টাকা সমান মূল্য বহন করে।

৪.৩.৪ বছরে একাধিকবার বাট্টাকরণের মাধ্যমে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ

উপরের উদাহরণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা বর্তমান মূল্য সম্পর্কে এই ধারণা লাভ করতে পারি যে, ১০ বছর পরের ১৯১,৪২৩ টাকার বর্তমান মূল্য হলো ৫০,০০০ টাকা। সুতরাং ভবিষ্যৎ মূল্য জানা থাকলে আমরা বর্তমান মূল্য বের করতে পারি। একাধিকবার চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ মূল্য থেকে আমরা

বাট্টাকরণের মাধ্যমে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করব। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি তুলে ধরা হলো:

উদাহরণ-৫: ৫ বছর পর ৫০,০০০ টাকা পাওয়ার আশায় তুমি বর্তমানে কিছু টাকা জমিয়ে ব্যাংকে রাখতে চাও। 'ক' ব্যাংক তোমাকে বার্ষিক ১০% হারে সুদ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে এবং 'খ' ব্যাংক তোমাকে ৯.৫% হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। এমতাবস্থায় তুমি কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখবে? এ সিদ্ধান্তটির জন্য আমরা দুটি প্রস্তাবেরই বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করব।

ব্যাংক-'ক' (১০% হারে বার্ষিক বাট্টাকরণ হলে)

$$PV = \frac{FV}{(১+i)^n}$$ (সূত্র ২ অনুযায়ী)

এখানে ভবিষ্যৎ মূল্য (FV) = ৫০,০০০ টাকা

সুদের হার (i) = ১০% বা ০.১০

বছরের সংখ্যা (n) = ৫ বছর

বর্তমান মূল্য (PV) = কত?

সূত্রে মান বসিয়ে, $PV = \frac{৫০,০০০}{(১+০.১০)^৫}$

$= \frac{৫০,০০০}{(১.১)^৫}$

= ৩১,০৪৬ টাকা।

ব্যাংক-'খ' (৯.৫% হারে মাসিক বাট্টাকরণ হলে)

সূত্র ৪: $$PV = \frac{FV}{(১+\frac{i}{m})^{m \times n}}$$

এখানে ভবিষ্যৎ মূল্য (FV) = ৫০,০০০ টাকা

সুদের হার (i) = ৯.৫% বা ০.০৯৫

বছরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা (m) = ১২

বছরের সংখ্যা (n) = ৫ বছর

বর্তমান মূল্য (PV) = কত?

সূত্রে মান বসিয়ে, $PV = \frac{৫০,০০০}{(১+\frac{০.০৯৫}{১২})^{৫ \times ১২}}$

$= \frac{৫০,০০০}{(১.০০৭৯১৬৬৬)^{৬০}}$

= ৩১,১৫২.৪৬ টাকা

অর্থাৎ ৫ বছর পর ৫০,০০০ টাকা পাওয়ার জন্য 'ক' ব্যাংক এ বর্তমানে ৩১,০৪৬ টাকা জমা দিতে হবে আর 'খ' ব্যাংক এ ৩১,১৫২.৪৬ টাকা জমা দিতে হবে। ফলে 'ক' ব্যাংকের প্রস্তাব লাভজনক।

৪.৪ প্রকৃত সুদের হার

গ্রামীণ মহাজন থেকে সাপ্তাহিক ১% হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ গ্রহণ করলে বার্ষিক সুদের হার হয় ৫২% কিন্তু ৫২ বার চক্রবৃদ্ধি হলে প্রকৃত সুদের হার ভিন্ন হয়। নিম্নলিখিত সূত্রটির মাধ্যমে সাপ্তাহিক ১% হারে চক্রবৃদ্ধির প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করা হলো :

সূত্র-৫ : $EAR = \left\{(১+\frac{i}{m})^{m} - ১\right\} \times ১০০$ (EAR=Effective Annual Rate)

এখানে, সাপ্তাহিক সুদের হার (r)	=	১%
বার্ষিক সুদের হার (i)	=	৫২%
বছরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা (m)	=	৫২
প্রকৃত সুদের হার (EAR)	=	কত?

সূত্রে মান বসিয়ে , EAR $= \left\{(১+\frac{.৫২}{৫২})^{৫২} - ১\right\} \times ১০০$

$= \left\{(১.০১)^{৫২} - ১\right\} \times ১০০$

$= ১.৬৭৭৬৮ - ১$

$= ৬৭.৭৭\%$

ধারণা : অর্থাৎ বার্ষিক ৬৭.৭৭% সুদের হার এবং সাপ্তাহিক ১% সুদের হার একই কথা।

> **কাজ :** মাসিক ২% হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ গ্রহণ করলে প্রকৃত সুদের হার কত হবে তা নির্ণয় কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থের সময়মূল্যের মূল কারণ কোনটি?

ক. সুদের হার গ. অর্থের তারল্য
খ. মুদ্রা নীতি ঘ. বর্ধিত মুনাফা

২. সুদাসলের উপর প্রদান করা হয় নিচের কোনটি?

ক. সরল সুদ গ. মোট সুদ
খ. চক্রবৃদ্ধি সুদ ঘ. নিট সুদ

৩. বাট্টাকরণ প্রক্রিয়া বলতে বোঝায়−

i. বাট্টার পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া
ii. অর্থের বর্তমান মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া
iii. সুদাসলকে সুদের হার দ্বারা ভাগের প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. নিচের কোনটির ক্ষেত্রে অর্থের সময়মূল্যের গুরুত্ব অপরিসীম?

ক. সুদের হার নির্ধারণ　　গ. আর্থিক অবস্থা নিরূপণ
খ. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ　　ঘ. ঋণের কিস্তি হ্রাস করা

৫. জনাব হারুন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কিছু টাকা তুলে ১২% চক্রবৃদ্ধি সুদে ডিজিটাল ব্যাংকে ৫ বছরের জন্য রাখতে চাইলে ব্যাংক মেয়াদ শেষে তাকে ৫,০০,০০০ টাকা দিতে চায়। জনাব হারুন কত টাকা জমা রাখতে চান?

ক. ২,০০,০০০ টাকা　　গ. ২,৮৩,৭১৩ টাকা
খ. ৩,১২,৫০০ টাকা　　ঘ. ৮,৮১,১৭১ টাকা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬, ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

শুভ, সৈনিক ও মুন্না এই তিন বন্ধু একত্রে তাদের ব্যবসায়িক এলাকায় কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার চালু করে। তাদের সার্ভিসিং সেন্টারের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে স্থানীয় ব্যাংকসমূহের নিকট তারা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করায় A নামক ব্যাংকটি ২০% বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদে এবং B ব্যাংক ১০% মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদে ২ বছর পর সুদসহ ঋণ পরিশোধ করার শর্তে ৫০,০০০/– টাকা ঋণ প্রদানে সম্মত হয়।

৬. 'A' ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করলে তাদের কে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে?

ক. ৬০,০০০ টাকা　　খ. ৭০,০০০ টাকা
গ. ৭২,০০০ টাকা　　ঘ. ৭৪,৩৪৬ টাকা

৭. 'B' ব্যাংক হতে ঋণ নেওয়া হলে কত টাকা সুদ পরিশোধ করতে হতো?

ক. ৫,০০০ টাকা　　খ. ১০,০০০ টাকা
গ. ১১,০১৯ টাকা　　ঘ. ১১,০২০ টাকা

৮. ব্যাংক নির্বাচনে উদ্দীপকের বন্ধুরা বিবেচনা করবে–

i. অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য
ii. অর্থের বর্তমান মূল্য
iii. প্রকৃত সুদের হার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। অর্থের সময়মূল্য কী?

২। চক্রবৃদ্ধি সুদ কী?

৩। সুদের হার বলতে কী বোঝায়?

৪। প্রকৃত সুদের হার কী?

৫। সুযোগ ব্যয় কী?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব আব্দুল আলীম একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ৬ বছরে টাকা দ্বিগুণ হয় বলে জানতে পারলেন। তিনি ব্যাংকে ২ লক্ষ টাকা জমা রাখতে গিয়ে তার বন্ধুর পরামর্শে ব্যাংকে না রেখে ১৩% সরল মুনাফায় একই মেয়াদের সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেন।

ক. সুদের হারের কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে কিসের পার্থক্য সৃষ্টি হয়?

খ. চক্রবৃদ্ধিকরণ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো।

গ. জনাব আব্দুল আলীমের অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য চক্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করো।

ঘ. অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জনাব আব্দুল আলীমের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো।

২. জনাব ফরহাদ হোসেন তার সঞ্চিত ১০ লক্ষ টাকা ১০% সুদে ১০ বছরের জন্য পদ্মা ব্যাংকে জমা রাখতে চান। কিন্তু তার স্ত্রী সালমা হোসেন তাকে ব্যাংকে জমা না রেখে নিজ পৌরসভায় জমি কেনার পরামর্শ দেন, যেখানে ৮ বছরে জমির মূল্য দ্বিগুণ হওয়ার এবং উক্ত সময়ের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা আয়ের নিশ্চয়তা আছে। বিষয়টি নিয়ে জনাব ফরহাদ হোসেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।

ক. বাট্টাকরণ প্রক্রিয়ায় অর্থের কোন মূল্যকে ভাগ করা হয়?

খ. অর্থের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্যের পার্থক্যকারী উপাদানটি ব্যাখ্যা করো।

গ. পদ্মা ব্যাংকের শর্তানুযায়ী জনাব ফরহাদ হোসেনের অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো।

ঘ. বিনিয়োগের জন্য জনাব ফরহাদ হোসেনের কোন ক্ষেত্রটি বাছাই করা উচিত? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা

Risk and Uncertainty

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিনিয়োগকারী পর্যন্ত সবাইকে লক্ষ্য অর্জনে বাধা দেয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত এবং প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সাধারণত গরমিল বা বিচ্যুতি থাকে। আর এ বিচ্যুতি থেকেই ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই ঝুঁকি ভূমিকা রাখে। ফলে ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকির পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়। এ অধ্যায়ে আমরা ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার বিভিন্ন দিক জানতে পারব।

ছবি: অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্পে ক্ষয়-ক্ষতির ছবি

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার উৎস চিহ্নিত করতে পারব।
- আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ঝুঁকিমুক্ত আয় ও ঝুঁকিবহুল আয়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।
- আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহার করে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।

৫.১ ভূমিকা

রোহান নবম শ্রেণির ছাত্র। সে তার এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রত্যাশা করে। রাশেদ সাহেব একজন কৃষক। তিনি এ বছর জমি থেকে ভালো ফলন প্রত্যাশা করেন। সুমনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ শেষ বর্ষের ছাত্রী। সে তার বিবিএ ডিগ্রি শেষ করে একটি ভালো চাকরি আশা করে। এখানে রোহানের জিপিএ ৫ পাওয়া, রাশেদ সাহেবের জমি থেকে ভালো ফলন এবং সুমনার ভালো চাকরি পাওয়া প্রতিটি বিষয় অনিশ্চিত। কারণ প্রতিটি বিষয় ভবিষ্যতের সাথে জড়িত। রোহান জিপিএ ৫ পেতে পারে, নাও পেতে পারে, রাশেদ সাহেবের জমিতে এ বছর ভালো ফলন হতে পারে, নাও পারে এবং সুমনা ভালো চাকরি পেতে পারে; নাও পেতে পারে। এভাবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভবিষ্যতে কোম্পানির পণ্যের আশানুরূপ বিক্রি হবে কি না, প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করতে পারবে কি না, প্রত্যাশিত মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করতে পারবে কি না-এরূপ অসংখ্য অনিশ্চয়তা থাকে। অনুরূপভাবে একজন বিনিয়োগকারী কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ পাবে কি না, একটি কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহ পাবে কি না এসব অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়।

এসব অনিশ্চয়তার কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রকৃত ফলাফল প্রত্যাশিত ফলাফলের চেয়ে কম বা বেশি হয়। প্রকৃত ফলাফল প্রত্যাশিত ফলাফল থেকে ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাকেই ব্যবসায় অর্থায়নে ঝুঁকি বলা হয়। যেমন: কোম্পানি আশা করছে, আগামী বছর ২০% নিট মুনাফা অর্জন করবে, কিন্তু প্রকৃত লাভ হলো ১৫%। এখানে, এই ৫% বিচ্যুতি ঝুঁকির উৎস। নিম্নে আরো কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হলো:

মনে করো, একটি কোম্পানি আগামী তিন বছর যথাক্রমে ৫০ লক্ষ টাকা, ৬৫ লক্ষ টাকা এবং ৭৫ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রি হবে বলে প্রত্যাশা করে। কিন্তু তিন বছর শেষে দেখা গেল উল্লিখিত বছরগুলোতে কোম্পানির পণ্য বিক্রি হয় যথাক্রমে ৪৫ লক্ষ টাকা, ৬৬ লক্ষ টাকা এবং ৭১ লক্ষ টাকা। আবার একজন বিনিয়োগকারী বছরে প্রতি শেয়ারে ১৫ কিন্তু বছর শেষে দেখা গেল, কোম্পানি প্রতি শেয়ারে মাত্র ১০ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করে। বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রত্যাশার থেকে প্রাপ্তির একটি ব্যবধান থাকে এবং এ ব্যবধান হওয়ার সম্ভাবনা থেকে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, কোনো বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রকৃত আয় বেশি হলেও ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে। যেমন: উক্ত বিনিয়োগকারী প্রতি শেয়ারে যখন ১৫ টাকা লভ্যাংশ প্রত্যাশা করে বছর শেষে ২০ টাকা লভ্যাংশ পায়, তখনো এই ৫ টাকা বিচ্যুতি ঝুঁকির উৎস বলে বিবেচিত। কারণ ওই অবস্থায় প্রকৃত আয় কেন প্রত্যাশিত আয় থেকে বেশি হলো সেই কারণ বিনিয়োগকারীর কাছে অজানা, এই কারণে সেটাও ঝুঁকি।

ঝুঁকির আরেকটি উদাহরণ এই রকম। দুটি বিনিয়োগের প্রথমটি থেকে আমরা গত তিন বছর ১০% হারে মুনাফা পেয়েছি। দ্বিতীয় বিনিয়োগ থেকে আমরা গত তিন বছর ৫%, ১০% ও ১৫% মুনাফা পেয়েছি। এখানে দুটি বিনিয়োগ প্রতিটির অর্জিত মুনাফার গড় সমান বা ১০% কিন্তু প্রথম বিনিয়োগ ঝুঁকিমুক্ত ও দ্বিতীয় বিনিয়োগ ঝুঁকিযুক্ত। কারণ ঝুঁকির আরেকটি ধারণা হলো আয়ের উত্থান-পতন। বেশি উত্থান-পতন হলে বেশি ঝুঁকি এবং উত্থান-পতন না হলে ঝুঁকি নেই।

৫.২ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য

যদিও অনিশ্চয়তা থেকে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, সব অনিশ্চয়তা ঝুঁকি নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, খারাপ কোনো ঘটনা ঘটার আশঙ্কাই হচ্ছে ঝুঁকি। কিন্তু খারাপ কোনো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা কেমন তা যদি জানা না থাকে, তবে সেই অনিশ্চয়তাকে ঝুঁকি বলা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, অনিশ্চয়তার যে অংশটুকু পরিমাপ করা যায় সে অংশকে ঝুঁকি বলা হয়। কিছু কিছু অনিশ্চয়তা আছে, যা পরিমাপ করা যায়না। উদাহরণস্বরূপ, একটি কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তার মৃত্যু হতে পারে, এটা একটা অনিশ্চয়তা, কিন্তু এই অনিশ্চয়তাকে পরিমাপ করা যায় না। ফলে এই রকম অনিশ্চয়তাকে ঝুঁকি বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, ঝুঁকি পরিমাপ করা যায় বলে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ঝুঁকির পরিমাণ কমানো যায়। কিন্তু অনিশ্চয়তাকে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে কমানো বা পরিহার করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ভূমিকম্পের কারণে কোনো কোম্পানির অফিস দালান ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু ভূমিকম্প কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে নেই বলে এই অনিশ্চয়তাকে কোম্পানি পরিহার করতে পারে না। পক্ষান্তরে, আগামী বছর কোম্পানির বিক্রয় কমে যাওয়ার আশঙ্কা একটি ঝুঁকি। কারণ, এই ঝুঁকি পরিমাপ করা যায় এবং এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কোম্পানি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারে। যেমন: অগ্রিম বিক্রি করতে পারে।

> কাজ : একটি পোল্ট্রি ফার্মের সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের তালিকা প্রস্তুত করো।

৫.৩ ঝুঁকির উৎস

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সাথে কিছু না কিছু ঝুঁকি জড়িত থাকে। এসব ঝুঁকির কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে এসব ঝুঁকি যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য এসব ঝুঁকির উৎস ও শ্রেণি খুঁজে বের করা জরুরি। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ের প্রেক্ষাপট আর বিনিয়োগকারীর প্রেক্ষাপট ভিন্ন। নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকির উৎস আলোচনা করা হলো।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে

ক. ব্যবসায়িক ঝুঁকি : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সফলভাবে চালানোর জন্য বিভিন্ন রকম পরিচালনা ব্যয়ের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকদের বেতন, অফিস ভাড়া, বিমা খরচ ইত্যাদি। এসব পরিচালনা খরচ পরিশোধের অক্ষমতা থেকে ব্যবসায়িক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। কোনো কোম্পানির পরিচালনা ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা নির্ভর করে বিক্রয় থেকে আয়ের স্থিতিশীলতা এবং পরিচালনা খরচের মিশ্রণ অর্থাৎ

স্থায়ী এবং চলতি খরচের অনুপাতের উপর। বিক্রয় আয়ে স্থিতিশীলতা না থাকলে অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ আয় সময় কোনো বেশি আবার কোনো সময় কম হলে, প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যয় মেটাতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। আবার পরিচালন ব্যয়ে স্থায়ী খরচ যেমন: অফিস ভাড়া, বিমা খরচ ইত্যাদির পরিমাণ বেশি হলে ব্যবসায়িক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। যদি কোম্পানিটি সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে অর্থাৎ কোম্পানি কোনো বহিস্থ অর্থায়ন না করে তখন মুনাফাসংক্রান্ত এই অনিশ্চয়তাকে ব্যবসায়িক ঝুঁকি বলে। এর উৎস হিসেবে বিক্রয়মূল্য পরিবর্তন, বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তন, উৎপাদনের উপকরণের মূল্য পরিবর্তন, অতিরিক্ত স্থায়ী খরচের প্রবণতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

খ. আর্থিক ঝুঁকি : এই ধরনের ঝুঁকি বহিস্থ উৎস থেকে অর্থায়নের ফলে সৃষ্টি হয়। যে প্রতিষ্ঠানের ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল বেশি, সেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঝুঁকি বেশি। কারণ ঋণ মূলধনের জন্য সুদ প্রদান করা বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হলে মুনাফা বণ্টন বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং ঋণ মূলধন ব্যবহার করা হলে ব্যবসায়টি যদি লাভজনক না হয় এবং ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তখন ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান আইনের আশ্রয় নিতে পারে। ফলে ব্যবসায়টি বিলোপসাধন হতে পারে। ঋণ মূলধন ব্যবহার করলে সুদ এবং উক্ত অর্থ পরিশোধের দায় সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোম্পানি **যদি ১৫% হারে ৫০ লক্ষ টাকার ৫ বছর মেয়াদি বন্ড বিক্রয় করে, তাহলে প্রতিবছর** ৭,৫০,০০০ টাকা সুদ এবং পাঁচ বছর শেষে ৫০ লক্ষ টাকা পরিশোধের দায় সৃষ্টি হয়। কোম্পানি সাধারণত ঋণকৃত মূলধন বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহ দিয়ে ঋণকৃত মূলধনের দায় পরিশোধ করে। কোনো কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ না পেলে দায় পরিশোধের অক্ষমতা দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিন দায় পরিশোধ করতে না পারলে ঋণ সরবরাহকারীরা কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে এবং কোম্পানি দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে এরূপ দায় পরিশোধের অক্ষমতা থেকে যে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়, তাকে আর্থিক ঝুঁকি বলা হয়।

কাজ : ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্যগুলো নির্ণয় করো।

বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে

ক. সুদ হারের ঝুঁকি : যেসব বিনিয়োগকারী বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় করে, তাদেরকে সুদ হারের ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হয়। কারণ বাজারে সুদের হারের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের বিনিয়োগের মূল্য ওঠা-নামা করে। সুদের হার বাড়লে এসব বিনিয়োগের অর্থাৎ বন্ড, ডিবেঞ্চারের বাজারমূল্য কমে, আবার সুদের হার কমলে এসব বিনিয়োগের বাজারমূল্য বাড়ে। সুদের হারের পরিবর্তনের কারণে বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসের আশঙ্কাকেই সুদ হারের ঝুঁকি বলা হয়।

খ. তারল্য ঝুঁকি : বিনিয়োগকারীর অর্থ শেয়ার, বন্ড বা ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে বিনিয়োগের পর যেকোনো সময় এসব বিনিয়োগ নগদায়নের প্রয়োজন হয়। আশা করা হয়, বিনিয়োগকারী এসব বিনিয়োগ যুক্তিসংগত মূল্যে বিক্রয় করে নগদায়ন করতে পারবে। কিন্তু কোনো কারণে যদি বিনিয়োগকারী

সহজে এবং যুক্তিসংগত মূল্যে বিক্রয় করতে না পারে, তখন তারল্য ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। তারল্য ঝুঁকি সাধারণত যে বাজারে এসব বিনিয়োগ যথা: শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি কেনাবেচা হয়, সে বাজারের আকার এবং কাঠামোর উপর নির্ভর করে। একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ে তারল্য ঝুঁকি অনেক বেশি। কারণ নগদ অর্থের প্রয়োজন হলে ব্যবসায়টির স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ সহজে ও যুক্তিসংগত মূল্যে বিক্রয় করা যায় না। পক্ষান্তরে, একজন বিনিয়োগকারী কোনো কোম্পানির শেয়ার কিনলে, তাকে তারল্য ঝুঁকি নিয়ে তেমন চিন্তা করতে হয় না। কারণ সে ইচ্ছে করলে যেকোনো সময় সেকেন্ডারি মূলধন বাজারে বা শেয়ার মার্কেটে গিয়ে তার শেয়ার বিক্রি করে দিতে পারে। মূলধনি বাজারে কোন বিনিয়োগকারী যদি কোম্পানির বন্ড বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করে, সেক্ষেত্রে তারল্য ঝুঁকি নিয়ে চিন্তা করতে হয়। কারণ আমাদের সেকেন্ডারি মূলধনি বাজারে যত সহজে শেয়ারের ক্রেতা পাওয়া যায়, তত সহজে বন্ড-ডিবেঞ্চারের ক্রেতা পাওয়া যায় না। তাই সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকে নগদায়ন করা সময়সাধ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে।

৫.৪ ঝুঁকির তাৎপর্য

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঝুঁকির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, যা ঝুঁকির তাৎপর্য বহন করে।

প্রথমত : যেকোনো কোম্পানির সাফল্য তথা সার্বিক উদ্দেশ্য সাধনে ঝুঁকির প্রভাব রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রত্যাশার বাইরে কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনাকেই ঝুঁকি বলা হয়। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়েই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঘটনাসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি কোম্পানি শুধু নদীপথে কাঁচামাল আনয়নের সুবিধার কথা চিন্তা করে নদীর ধারে কারখানা স্থাপনা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দু-এক বছর পরে জলোচ্ছ্বাসে, নদীভাঙনের ফলে কারখানাটি নদীতে বিলীন হয়ে গেলে প্রতিষ্ঠানকে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। ফলে কোম্পানিটির সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে না। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যদি এই আশঙ্কার কথা আগে থেকেই বিবেচনা করত, তবে হয়তো ঠিক নদীর পাড়েই কারখানা স্থাপন করত না এবং তাতে করে একটি সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হতো।

দ্বিতীয়ত : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন নির্ভর করে পণ্যের বাজার চাহিদার উপর। ফলে ব্যবসায় শুরু করার আগেই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে বাজার চাহিদা সম্পর্কিত তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে বাস্তবসম্মত চাহিদার অনুমান করে সেই অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে হয়। বাজারের প্রকৃত চাহিদা অনুমেয় চাহিদা থেকে কম বা বেশি হতে পারে। কোনো কারণে প্রকৃত বিক্রয় অনুমেয় বিক্রয় থেকে খুব কম হলে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বর্ষাকালে অতি বৃষ্টিপাত আশা করে ছাতা প্রস্তুতকারী একটি কোম্পানি অধিক ছাতা প্রস্তুত করে; কিন্তু পরবর্তীতে যদি বর্ষাকালে কম বৃষ্টিপাত হয়, ছাতা প্রস্তুতকারীর ছাতা অবিক্রীত থাকার সম্ভাবনা থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে প্রয়োজনীয় মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় ছাতার সাথে যদি অন্য কিছু পণ্যও কোম্পানি তৈরি করত, তবে হয়তো বৃষ্টি কম হলেও সেই পণ্যের চাহিদা হ্রাস পেত না এবং ব্যবসায়টি কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করতে পারত।

৫.৫ ঝুঁকিমুক্ত আয় ও ঝুঁকিবহুল আয়

সকল আয় ঝুঁকিবহুল নয়, কিছু আয় আছে যা ঝুঁকিমুক্ত আয় হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ এ রকম আয়ে, প্রকৃত আয় সব সময় প্রত্যাশিত আয়ের সমান হয়। কোনো ব্যাংকে যদি তুমি মেয়াদি আমানত রাখ, তবে এর প্রত্যাশিত আয় ও বাস্তব আয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য হয় না। এটা ঝুঁকিমুক্ত আয়ের একটি ধরন। কোনো দেশের সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ড থেকে প্রাপ্ত আয় ঝুঁকিমুক্ত আয় হিসেবে গণ্য হয়। সরকার কর্তৃক ইস্যু হয় বলে এসব বিনিয়োগকে ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় নির্দিষ্ট থাকে বলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট হারে আয় পাওয়া যায় বলে, প্রাপ্ত আয়কে ঝুঁকিমুক্ত আয় হিসেবে গণ্য করা যায়।

প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রকৃত আয়ের মধ্যে ব্যবধান হবার সম্ভাবনা হচ্ছে ঝুঁকি। সাধারণত আয়ের একটা ধরন ঝুঁকিমুক্ত আর অন্যটি ঝুঁকিযুক্ত। যেসব আয়ের সাথে ঝুঁকি জড়িত সেসব আয়কে ঝুঁকিবহুল আয় বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিনিয়োগকারী কোনো কোম্পানির সাধারণ শেয়ার ক্রয় করলে ভবিষ্যতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি তার প্রত্যাশিত লভ্যাংশের সমান হবে-এরকম কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। ভবিষ্যতে কোম্পানি কী পরিমাণ লভ্যাংশ দেবে সেটা নির্ভর করে ভবিষ্যৎ বছরগুলোতে অর্জিত মুনাফা এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর। অতএব, বিনিয়োগকারীর জন্য উক্ত শেয়ার থেকে আয় একটি ঝুঁকিবহুল আয় হিসেবে পরিগণিত হবে। এমনকি আয় নির্দিষ্ট থাকে না বলে সাধারণ শেয়ার থেকে প্রাপ্ত আয় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিবহুল আয় হিসেবে গণ্য হয়।

৫.৬ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পরিমাপ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনার জন্য ঝুঁকি পরিমাপ করা অত্যাবশ্যকীয়। প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রকৃত আয়ের বিচ্যুতি থেকেই ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। প্রত্যাশিত আয় থেকে প্রকৃত আয়ের বিচ্যুতি যত বেশি হয়, ঝুঁকি তত বাড়ে, আয়ের বিচ্যুতি যত কমে ঝুঁকি তত কমে। এ কারণে প্রত্যাশিত আয় এবং প্রকৃত আয়ের বিচ্যুতি বা প্রত্যাশিত ফলাফল এবং প্রকৃত ফলাফলের বিচ্যুতি থেকে ঝুঁকি পরিমাপ করা হয়।

ঝুঁকি পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রয়োজন বা অবস্থাভেদে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই পর্যায়ে আমরা ঝুঁকি পরিমাপের জন্য আদর্শ বিচ্যুতির ব্যবহার দেখব।

আদর্শ বিচ্যুতি : আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহার করে অতীতে অর্জিত আয়ের বিচ্যুতি থেকে যেমন ঝুঁকি পরিমাপ করা হয়, তেমনি ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয়ের ঝুঁকি ও পরিমাপ করা হয়। এটি একটি পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি। নিচে আদর্শ বিচ্যুতির সূত্র দেওয়া হলো :

$$\text{আদর্শ বিচ্যুতি} = \sqrt{\frac{\sum(\text{আয় হার - গড় হার})^2}{n-১}}$$

এখানে,

$\sum(\text{আয় হার-গড় হার})^2$ = অতীতে অর্জিত আয় হার থেকে গড় আয় হারের পার্থক্যের বর্গের সমষ্টি

n = বছরের সংখ্যা

উদাহরণ : নিচের ছকে, একটি প্রকল্পের ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের আয় দেয়া আছে। আমরা এর আয় ও ঝুঁকি গণনা করব।

বছর	আয় (%)	গড় থেকে ব্যবধান (আয় - গড়) (%)	ব্যবধানের বর্গ (%)
২০১৫	২০	(২০-১৩)=৭	(৭×৭)=৪৯
২০১৬	৫	(৫-১৩)=-৮	(-৮×-৮)=৬৪
২০১৭	-৫	(-৫-১৩)=-১৮	(-১৮×-১৮)=৩২৪
২০১৮	১৫	(১৫-১৩)=২	(২×২)=৪
২০১৯	৩০	(৩০-১৩)=১৭	(১৭×১৭)=২৮৯
যোগফল =	৬৫%	ব্যবধানের বর্গের যোগফল=	৭৩০
গড় আয়	৬৫/৫=১৩%	ব্যবধানের বর্গের গড়=৭৩০/(n-১)	১৮২.৫

আদর্শ বিচ্যুতি $= \sqrt{১৮২.৫}$

$= ১৩.৫\%$

প্রথমে পাঁচ বছরের আয় যোগ করে ৫ দিয়ে ভাগ করলে আমরা গত পাঁচ বছরের গড় আয় পাব। টেবিলে এটা দেখা যাচ্ছে ১৩%। এবার ঝুঁকি গণনার জন্য আদর্শ বিচ্যুতি গণনা করতে হবে। প্রথমে আমরা প্রতিবছরের আয় থেকে গড় আয় বা ১৩%-এর ব্যবধান বের করব। এর পরের কলামে এটাকে বর্গ করতে হবে। এবার উক্ত বর্গসমূহের যোগফল বের হলো ৭৩০। একে (n-১) বা (৫-১) বা ৪ দিয়ে ভাগ করতে হবে। যত বছরের আয় তা থেকে সর্বদাই ১ কম দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফলকে বর্গমূল করলে আমরা আদর্শ বিচ্যুতি পাব। উদাহরণে এটা ১৩.৫%। সুতরাং ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত আয়ের ভিত্তিতে আমাদের গড় আয় ১৩% আর ঝুঁকির পরিমাণ ১৩.৫%। এই আয় ও ঝুঁকি ব্যবহার করে আমরা ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে পারব। যেমন: এর বিকল্প একটা প্রকল্পে যদি আমরা ১৩% আয় পাই এবং ১৫% আদর্শ বিচ্যুতি বা ঝুঁকি পাই, তবে সেটা থেকে আমাদের প্রথম প্রকল্প বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ একই আয়ে কম ঝুঁকি বেশি গ্রহণযোগ্য। আবার অন্য একটি বিকল্প প্রকল্পে যদি সমান ঝুঁকি হয় কিন্তু লাভের গড় কম হয়, তবে সেটা থেকেও আমাদের মূল প্রকল্প বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ সমান ঝুঁকিতে অধিক লাভ বেশি গ্রহণযোগ্য।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ নীতি : সাধারণত আদর্শ বিচ্যুতির বড় মান অধিক ঝুঁকি এবং আদর্শ বিচ্যুতির ছোট মান কম ঝুঁকি নির্দেশ করে। সমান আয়ে কম ঝুঁকি বেশি গ্রহণযোগ্য এবং সমান ঝুঁকিতে অধিক লাভ বেশি গ্রহণযোগ্য।

কাজ : একজন বিনিয়োগকারীর গত দশ বছরে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ের হার যথাক্রমে ১০%, ২০%, -৫%, ১৫%, ৩৫%, ১০%, ২৫%, ৩০%, ১২% ও ০%। আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অফিস খরচ, বিমা খরচ ইত্যাদি পরিশোধের অক্ষমতা থেকে কী সৃষ্টি হয়?

ক. আর্থিক ঝুঁকি
খ. মূলধনের স্বল্পতা
গ. ব্যবসায়িক ঝুঁকি
ঘ. মুনাফার অনিশ্চয়তা

২. কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে?

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে
খ. পরিকল্পনা প্রণয়নে
গ. পরিচালনার ক্ষেত্রে
ঘ. মূলধন সংগ্রহে।

৩. ঝুঁকির পরিমাপ করা হয়–

i. বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে
ii. সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে
iii. প্রতিষ্ঠানের ব্যয় কমিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রত্যাশার বাইরে কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনাকে কী বলে?
২. আদর্শ বিচ্যুতি কোন ধরনের পদ্ধতি?

সৃজনশীল প্রশ্ন

রায়না হক ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ শেষে অনেক চিন্তাভাবনার পর 'আহবান ক্রাফট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এটি ঢাকা ও কুমিল্লা শহরে অবস্থিত। তার বান্ধবী রোমানা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট থেকে পাস করে মণিপুরী তাঁত বস্ত্রের বিভিন্ন পোশাকসামগ্রীর ব্যবসায় শুরু করেন সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাদের কয়েক বছরের ব্যবসায়ের চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো।

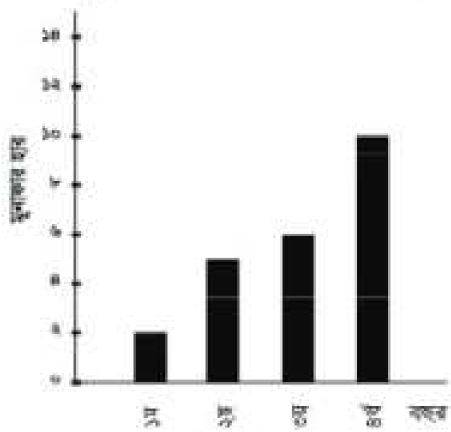

রায়না হক

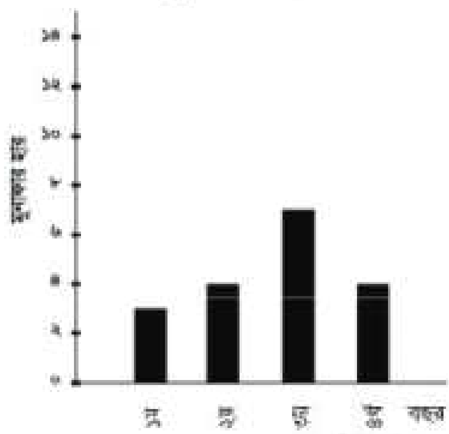

রোমানা

ক. অতীতে অর্জিত আয়ের বিচ্যুতি থেকে কী পরিমাপ করা হয়?

খ. ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলের চেয়ে প্রকৃত ফল কম হওয়ার কারণটি ব্যাখ্যা করো।

গ. রোমানার ব্যবসায় কম সাফল্য হবার কারণটি বর্ণনা করো।

ঘ. রায়না ও রোমানার ব্যবসায়িক চিত্রটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিনিয়োগকারীর নাম– জনাব শফিকুর রহমান

বিনিয়োগ করা প্রতিষ্ঠানের নাম : ক) ঝর্ণা কোম্পানি লিমিটেড

খ) আজাদ কোম্পানি লিমিটেড

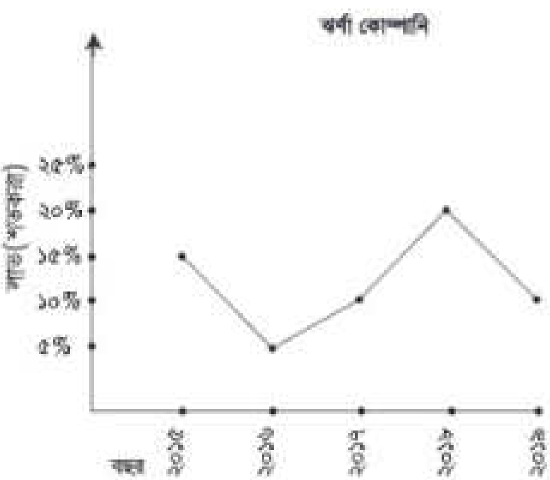

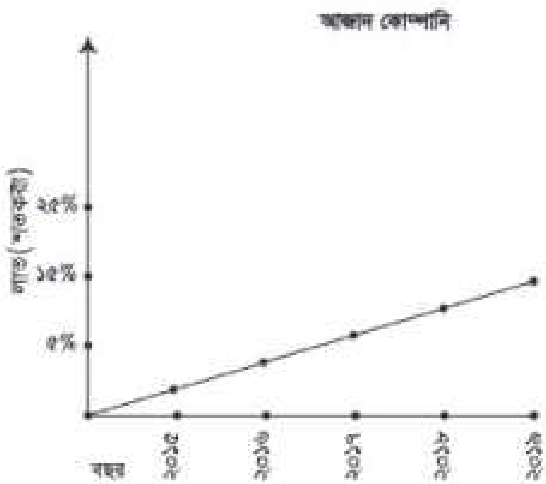

ক. ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঘটনাসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কোন ধরনের ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়?

খ. বন্ডে বিনিয়োগকারীদের কোন ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হয়? বর্ণনা করো।

গ. ঝর্ণা কোম্পানির আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করো।

ঘ. জনাব শফিকুর রহমানের আজাদ কোম্পানিতে বিনিয়োগের প্রভাব ব্যাখ্যা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মূলধনি আয়-ব্যয় প্রাক্কলন
Capital Budgeting

যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও টিকে থাকা নির্ভর করে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের উপর। উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় পরিচালনার বিভিন্ন সময় স্থায়ী সম্পত্তি যেমন : জমি, দালানকোঠা, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়, এসব স্থায়ী সম্পত্তি প্রতিস্থাপন, উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকায়ন, নতুন পণ্য বাজারে ছাড়া–এরকম অনেক দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এসব বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত কোম্পানির জন্য কতটুকু লাভজনক হবে বা আদৌ লাভজনক হবে কি না, সেজন্য এসব বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের সঠিক মূল্যায়নের জন্য কিছু পদ্ধতি বা নীতিমালা দরকার। অর্থায়নের যেসব পদ্ধতি বা নীতিমালা এসব দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ে জানতে পারব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা —

- মূলধন বাজেটিং - এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মূলধন বাজেটিং - এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- মূলধন বাজেটিং - এর বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে পারব।
- মূলধন বাজেটিং - এর বিভিন্ন কৌশলের সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

৬.১ মূলধন বাজেটিং

তিন বন্ধু রহিম, করিম ও শংকর আলাদা আলাদা ব্যবসায় করেন। কিছুদিন ধরে রহিম তার মুদির দোকানের জন্য একটি ফ্রিজ কেনার চিন্তা ভাবনা করছেন। ছয় মাস পূর্বে করিম একটি সেলাই মেশিন দিয়ে তার দর্জি ব্যবসায় শুরু করে। অতিরিক্ত চাহিদার কথা চিন্তা করে বর্তমানে তিনি আরেকটি সেলাই মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত নিলেন। অন্যদিকে শংকর একটি আধুনিক সেলুন ব্যবসায় শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র (হুইল চেয়ার) ও চুল কাটার মেশিন কেনার চিন্তা করছেন। এখানে মুদির দোকানের ফ্রিজ, দর্জি ব্যবসায়ের সেলাই মেশিন এবং সেলুনের হুইল চেয়ার ও চুল কাটার মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত একেকটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। এসব দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য কতটুকু লাভজনক হবে বা আদৌ লাভজনক হবে কি না, সে জন্য ফিন্যান্সের একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন। মূলধন বাজেটিং এরূপ একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের বা প্রকল্পের আয়-ব্যয় প্রাক্কলন করতে হয়। আয়-ব্যয় প্রাক্কলন শেষে এসব সিদ্ধান্তের বা প্রকল্পের নিট নগদ প্রবাহ বা নিট মুনাফা নির্ধারণ করা হয়। এখানে আয় বলতে বিক্রয় থেকে অর্জিত অর্থ এবং ব্যয় বলতে কাঁচামাল খরচ, বিক্রয় খরচ এবং অবচয়সহ অন্যান্য খরচকে বোঝায়। আয় থেকে ব্যয় বাদ দিলে করপূর্ব মুনাফা এবং করপূর্ব মুনাফা থেকে কর বাদ দিলে নিট মুনাফা পাওয়া যায়। আবার নিট মুনাফার সাথে অবচয় যোগ করলে নগদ অন্তঃপ্রবাহ পাওয়া যায়। এই অন্তঃপ্রবাহের সাথে প্রারম্ভিক বিনিয়োগ বা নগদ বহিঃপ্রবাহের সাথে তুলনা করে যদি অন্তঃপ্রবাহ বহিঃপ্রবাহ থেকে বেশি হয় তাহলে বিনিয়োগটি লাভজনক প্রতীয়মান হয় এবং গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে মূলধন বাজেটিং প্রক্রিয়া বলা হয়।

অতএব বলা যায়, মূলধন বাজেটিং হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তি যেমনঃ জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় থেকে শুরু করে এসব সম্পত্তির প্রতিস্থাপন, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ যেমনঃ নতুন মেশিন স্থাপন, উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের আয়-ব্যয় প্রাক্কলন করে সম্ভাব্য লাভজনকতা বিশ্লেষণ করে তদনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৬.২ মূলধন বাজেটিং-এর গুরুত্ব

মূলধন বাজেটিং অর্থায়নের সাফল্যের চাবিকাঠি। মূলধন বাজেটিং বাস্তবসম্মত ও সঠিক হলে ব্যবসায়ের সরাসরি উপকৃত হয়। মূলধন বাজেটিং ব্যর্থ হলে ব্যবসায়টিও সাধারণত ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতার দায়িত্ব অর্থ ব্যবস্থাপককে নিতে হয়। মূলধন বাজেটিং এত গুরুত্বপূর্ণ হবার কয়েকটি কারণ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১. মুনাফা-সংক্রান্ত : একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। মুনাফা অর্জনে মূলধন বাজেটিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোম্পানি সাধারণত নগদ প্রবাহ পাবার আশায় তার দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগযোগ্য তহবিল বিভিন্ন সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অনেকটা নির্ভর করে মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্তের উপর। মুদির দোকানির ফ্রিজ কেনার ফলে স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা পানীয় ও আইসক্রিম বিক্রয়

বৃদ্ধি পাবে। ফলে ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দোকানির আশেপাশের লোকজন যদি ঠান্ডা পানীয় ও আইসক্রিম খেতে অভ্যস্ত না হয় সেক্ষেত্রে ফ্রিজ কেনার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো সুবিধা আনবে না। সুতরাং, ভালো বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত যেমন ব্যবসায়টির জন্য পর্যাপ্ত আয় নিশ্চিত করতে পারে, অন্যদিকে ত্রুটিপূর্ণ বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের কারণে ব্যবসায়টি লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে। তাই বলা যায়, মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত একটি ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

২. বিনিয়োগের বিশাল আকার: স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়, সংযোজন, আধুনিকায়ন এবং প্রতিস্থাপন প্রভৃতি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণত বড় অঙ্কের তহবিল প্রয়োজন হয়। ফলে কোনো কারণে সিদ্ধান্তে ভুল হলে সেটি সংশোধন করার সাধারণত সুযোগ থাকে না এবং সংশোধনের সুযোগ থাকলেও বড় অঙ্কের মাশুল দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি কোম্পানি ঢাকার অদূরের একটি জায়গায় তাদের কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় এই ভেবে যে সেখানে সময়মতো বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সরবরাহ পাবে। কিন্তু কারখানা স্থাপনের পর দেখা গেল সরকার নতুন বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সংযোগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমতাবস্থায় কোম্পানিটি কারখানায় উৎপাদন আরম্ভ করতে পারবে না। কিন্তু কোম্পানিটিকে হয়তো এ কারণে ব্যাংক থেকে বড় আকারের ঋণ নিতে হয়েছে, যার সুদ ব্যাংকে নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। ফলে এরকম একটি ভুল সিদ্ধান্ত ব্যবসায়টিকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অল্প টাকার ব্যাপার হলে অন্য কোথাও থেকে হয়তো, অর্থ সংকুলান করা যেত কিন্তু বড় বিনিয়োগ বলে তেমন সুযোগও নেই। এখন যদি প্রকল্পটি বিক্রয় করে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেখানে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাবে না। কারণ প্রকল্পটি ইতিমধ্যে অলাভজনক প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং কোম্পানিটিকে বড় অঙ্কের মাশুল দিতে হবে।

৩. ঝুঁকির ভিত্তিতে: মূলধন বাজেটিং-এর অধিকাংশ অনুমানই ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল। একটি স্থায়ী সম্পত্তি যেমন: মেশিনটিতে বিনিয়োগ করা উচিত কি না এই সিদ্ধান্তটি নির্ভর করে ওই মেশিনটিতে উৎপাদিত পণ্য ভবিষ্যতে কত টাকা করে এবং কী পরিমাণে বিক্রয় হবে, কত টাকায় পণ্যটি উৎপাদন হবে ইত্যাদির উপর। ভবিষ্যতের এই তথ্য-উপাত্ত অনুমাননির্ভর, যা বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে। সুতরাং, মূলধন বাজেটিং সর্বদাই ঝুঁকিযুক্ত সিদ্ধান্ত। যেমন: বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের আশংকা করে ছাতা প্রস্তুতকারী তার ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ করে ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নতুন মেশিন কিনে অধিক ছাতা উৎপাদন করে। উৎপাদনকারীর প্রাক্কলন অনুযায়ী বর্ষাকালে বৃষ্টি না হলে আশানুরূপ ছাতা বিক্রি হবে না। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এজন্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকির গ্রহণযোগ্যতা যাচাই প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে মূলধন বাজেটিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬.৩ মূলধন বাজেটিং-এর প্রয়োগ

দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সব ক্ষেত্রেই মূলধন বাজেটিং প্রয়োগ করা হয়। স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় থেকে শুরু করে, ব্যবসায়ের প্রসার, ব্যবসায়ের আধুনিকায়ন, স্থায়ী সম্পত্তির প্রতিস্থাপন এবং নতুন পণ্য বাজারে ছাড়া সংক্রান্ত সকল প্রকার বিনিয়োগ ক্ষেত্রে মূলধন বাজেটিং-এর প্রয়োগ রয়েছে। এবার আমরা মূলধন বাজেটিং প্রয়োগের কয়েকটি জনপ্রিয় ক্ষেত্র আলোচনা করব।

স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয় : যেকোনো কোম্পানি নতুন ব্যবসায় শুরু করতে গেলে স্থায়ী সম্পত্তি যেমন: জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, মুদি দোকানিকে তার ব্যবসায় শুরু করার সময় ফ্রিজ, তাকিয়া, ওজন মাপার স্কেল প্রভৃতি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। রেস্টুরেন্ট মালিককে তার ব্যবসায় শুরুর সময় চেয়ার, টেবিল, হাঁড়ি-পাতিল, রান্নার অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অনুরূপভাবে বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি, দালানকোঠা, কারখানা নির্মাণ ব্যয়, মেশিনারিজ ক্রয় ইত্যাদি সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এসব সম্পত্তি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলধন বাজেটিং প্রয়োগ করা হয়। ব্যবসায় চলতে চলতে বিভিন্ন সময়ে এসব স্থায়ী সম্পত্তি অকেজো বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় এসব স্থায়ী সম্পত্তি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রেও মূলধন বাজেটিং প্রয়োগ করে কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যবসায়ের পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সম্প্রসারণ : চলমান কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তার ব্যবসায় শুরু করার পর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোম্পানির নতুন মেশিন ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, দর্জির দোকানি তার বর্তমান ব্যবসায় ১টি সেলাই মেশিন থাকা সত্ত্বেও ভোক্তাদের ঈদের চাহিদার কথা চিন্তা করে নতুন আর একটি সেলাই মেশিন কেনার চিন্তা করতে পারে। মুদির দোকানি তার দোকানে ফ্রিজ থাকা সত্ত্বেও আরেকটি ফ্রিজ কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এজন্য দোকানিকে নতুন মেশিন ক্রয় বাবদ কত ব্যয় হবে ব্যবসায়ের আয় তাতে কত বাড়বে ইত্যাদি প্রাক্কলন করে মূলধন বাজেটিং প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

পণ্য বৈচিত্র্যায়ণ : কোম্পানিকে তার ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য চলমান পণ্যের পাশাপাশি নতুন পণ্য বাজারে ছাড়ার প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোম্পানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য আমের জুসের পাশাপাশি কমলার জুস বা আপেলের জুস বাজারে ছাড়ার চিন্তা করতে পারে। নতুন পণ্য বাজারে ছাড়ার ক্ষেত্রে নতুন পণ্যের আয়ুষ্কাল, পণ্যের উৎপাদন খরচ, বাজার চাহিদা, পরিচালনা খরচ এবং সম্ভাব্য আয় প্রাক্কলন করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রে মূলধন বাজেটিং-এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

প্রতিস্থাপন ও আধুনিকায়ন : প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ব্যবসায়ের উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিস্থাপন ও আধুনিকায়নের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, দর্জির দোকানি পা-চালিত সেলাই মেশিনের পরিবর্তে বিদ্যুৎ চালিত সেলাই মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অন্যদিকে চুল কাটার সেলুনের মালিক তার দোকানের ভেতরের সাজসজ্জা পরিবর্তন করে এসি সেলুন বানানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন খরচ কমানো এবং এর মাধ্যমে ব্যবসায়ের লাভ বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে কোম্পানির পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির সাথে নতুন পদ্ধতির তুলনা প্রয়োজন হয়। উভয় পদ্ধতিতে কোম্পানি আয়, পরিচালনা ব্যয়, আয়ুষ্কাল ইত্যাদি হিসাব করে নিট নগদ প্রবাহ নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। অতএব, উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিস্থাপন ও আধুনিকায়নে মূলধন বাজেটিংয়ের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

৬.৪ মূলধন বাজেটিং-এর প্রক্রিয়া

দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে মূলধন বাজেটিং-প্রক্রিয়া প্রয়োগে জড়িত ধাপগুলো নিম্নরূপ :

ক) নগদ প্রবাহ প্রাক্কলন
খ) বাট্টা হার নির্ধারণ
গ) মূলধন বাজেটিং পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ

ক. নগদ প্রবাহ প্রাক্কলন : যেকোনো দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত যেমন: স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ, উৎপাদন পদ্ধতির যান্ত্রিকীকরণ এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে নগদ প্রবাহ জড়িত। মূলধন বাজেটিং-প্রক্রিয়া প্রয়োগের প্রথম ধাপ হচ্ছে নগদের আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ প্রাক্কলন করা। প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ প্রাক্কলন করতে প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় পূর্বানুমান, চলতি খরচ পূর্বানুমান, মূলধনি ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে। বিক্রয় থেকে প্রতিষ্ঠানের নগদ আন্তঃপ্রবাহ ঘটে এবং চলতি খরচ, মূলধনি ব্যয় এবং অন্যান্য খরচের মাধ্যমে নগদ বহিঃপ্রবাহ ঘটে। এখানে বিক্রয় অনুমান, চলতি খরচ, স্থায়ী খরচ প্রত্যেকটি বিষয় অতি সতর্কতার সাথে নির্ধারণ করতে হয়। আগেই বলেছি একটি প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয় অনুমান করতে হলে প্রতিটি পণ্যের ভবিষ্যতে বিক্রয়মূল্য এবং প্রতিবছর কতগুলো পণ্য বিক্রি হবে তা পূর্বানুমান করতে হয়। এগুলো পূর্বানুমানের পর প্রতিবছর বিক্রি থেকে মোট অর্জিত আয় পাওয়া যায়। এই অর্জিত আয় থেকে নগদ আন্তঃপ্রবাহ পাওয়া যায়। অতএব বলা যায়, নগদ প্রবাহের সঠিক প্রাক্কলন নির্ভর করে পণ্যের ভবিষ্যৎ বছরগুলোতে বিক্রয়মূল্য এবং কতগুলো পণ্য বিক্রয় হবে তার উপর। এ কারণে, ভবিষ্যৎ বিক্রয়মূল্য অনুমানে বা পণ্য বিক্রির সংখ্যা অনুমানে ভুল হলে সেটির প্রভাব নগদ প্রবাহকে প্রভাবিত করে। অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠানের মোট খরচের মাধ্যমে নগদ বহিঃপ্রবাহ ঘটে। একটি প্রতিষ্ঠানের চলতি খরচ এবং স্থায়ী খরচ মিলে মোট খরচ হয়। চলতি খরচ বলতে কাঁচামাল ক্রয় বাবদ খরচ, কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য পরিচালনা খরচ এবং স্থায়ী খরচ বলতে অফিস ভাড়া, বিমা খরচ, অবচয়সহ অন্যান্য খরচকে বোঝানো হয়। বিক্রয় অনুমানের মতো প্রত্যেক চলতি খরচ এবং স্থায়ী খরচ পূর্বানুমানে অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কোনো কারণে এসব খরচ অনুমানে ভুল হলে মূলধন বাজেটিং ভুল সিদ্ধান্ত দিতে পারে, যে কারণে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খ. বাট্টা হার নির্ধারণ : নগদ প্রবাহ নির্ধারণ করার পর সেগুলোকে বর্তমান মূল্যে রূপান্তর করার জন্য বাট্টা হার প্রয়োজন হয়। অর্থের সময় মূল্য অধ্যায়ে তোমরা জেনেছ যে, ভবিষ্যৎ বছরগুলোতে আগত নগদ প্রবাহের পরিমাণ সমান হলেও সেগুলোর বর্তমান মূল্য সমান হয় না। অর্থের সময়মূল্য অনুযায়ী নগদ প্রবাহ যত দেরিতে পাওয়া যায়, সেটির বর্তমান মূল্য তত কম। বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্প থেকে যেহেতু বেশ কয়েক বছর ধরে নগদ প্রবাহ পাওয়া যায়, সেহেতু মূলধন বাজেটিং-এর মাধ্যমে সঠিক বিনিয়োগ সুযোগ নিতে হলে ভবিষ্যতে আগত নগদ প্রবাহগুলোর বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে হয়। বাট্টাকরণ প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতের নগদ প্রবাহকে বর্তমান মূল্যে রূপান্তর করা হয়। এ কারণে বাট্টা হারের প্রয়োজন হয়। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের মূলধন খরচকে মূলধন বাজেটিং-প্রক্রিয়ার বাট্টা হার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মূলধন ব্যয় সম্পর্কে তোমরা পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত জানতে পারবে।

গ. মূলধন বাজেটিং পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগ : নগদ প্রবাহ প্রাক্কলন এবং বাট্টা হার নির্ধারণের পর মূলধন বাজেটিং পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য মূলধন বাজেটিং-এর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রত্যেকটি পদ্ধতি সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। প্রত্যেকটি পদ্ধতির কিছু সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্পের ধরন, ঝুঁকি এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে সঠিক পদ্ধতিটি নির্বাচন ও প্রয়োগ করতে হয়।

৬.৫ মূলধন বাজেটিং-এর পদ্ধতিসমূহ

প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলধন বাজেটিং-এর বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং সার্বিকভাবে লাভজনক বিনিয়োগ বা প্রকল্প নির্বাচন করাই মূলধন বাজেটিং পদ্ধতিসমূহের কাজ। উদাহরণ: দর্জির দোকানির সেলাই মেশিন, মুদির দোকানির ফ্রিজ এবং চুল কাটার সেলুনে মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত ব্যবসায়ের জন্য লাভজনক হবে কি না, এসব সিদ্ধান্তে মূলধন বাজেটিং পদ্ধতি সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে। মূলধন বাজেটিং-এর পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ:

১. গড় মুনাফার হার পদ্ধতি Accounting Rate of Return (ARR) Method
২. পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি Pay Back Period (PBP) Method
৩. নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি Net Present Value (NPV) Method
৪. অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার পদ্ধতি Internal Rate of Return (IRR) Method

১. গড় মুনাফার হার পদ্ধতি

মূলধন বাজেটিং-এর একটি সহজ পদ্ধতি হলো গড় মুনাফার হার পদ্ধতি। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি গড় মুনাফা হার নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহের পরিবর্তে প্রত্যাশিত নিট মুনাফাকে বিবেচনা করা হয়। তোমরা জেনেছ যে, বিক্রয় থেকে করসহ সব খরচ বাদ দিলে নিট মুনাফা পাওয়া যায়। প্রত্যাশিত বার্ষিক গড় নিট মুনাফাকে গড় বিনিয়োগ দিয়ে ভাগ করলে গড় মুনাফার হার পাওয়া যায়। অর্থাৎ,

$$\text{গড় মুনাফার হার} = \frac{\text{গড় নিট মুনাফা}}{\text{গড় বিনিয়োগ}} \times ১০০$$

এ পদ্ধতিতে প্রকল্পের প্রত্যাশিত নিট মুনাফার সমষ্টিকে মোট বছরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে গড় মুনাফা এবং নিট বিনিয়োগকে ২ দিয়ে ভাগ করলে গড় বিনিয়োগ পাওয়া যাবে।

সিদ্ধান্ত নীতি

- গড় মুনাফার হার যত বেশি হয় তত ভালো। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যদি প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়, তবে ব্যাংকের একটি চাহিদা থাকে। গড় মুনাফার হার ব্যাংকে সুদ অপেক্ষা কম হলে ঋণ পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় প্রকল্পটির গড় মুনাফা হার অধিকতর হলে গ্রহণযোগ্য। কোনো কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে গড় মুনাফার একটি সর্বনিম্ন হার পূর্বনির্ধারিত থাকে। নির্দিষ্ট কোনো বিনিয়োগ বা প্রকল্পের জন্য নির্ণীত গড় মুনাফার হার কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন হার থেকে কম হলে বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্পটি

বাতিল বা বর্জন করা হয়। পক্ষান্তরে গড় মুনাফার হার যদি কাঙ্ক্ষিত হার থেকে বেশি হয়, তবে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

- একাধিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত নীতি অনুসারে গ্রহণযোগ্য বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্পগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানো হয় এবং প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্প নির্বাচন করা হয়।

গড় মুনাফা হার পরিমাপ করার সূত্রে তেমন জটিলতা না থাকার কারণে এটি বোঝা সহজ। আবার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায় বলে এটি অনেকের কাছে জনপ্রিয়। তবে পদ্ধতিটির কিছু অসুবিধা রয়েছে। প্রথমত, গড় মুনাফার হার পদ্ধতি নগদ প্রবাহের পরিবর্তে নিট মুনাফা ব্যবহার করে, নিট মুনাফার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে বলে অনেকে পদ্ধতিটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করে না। দ্বিতীয়ত, পদ্ধতিটি অর্থের সময় মূল্যকে বিবেচনা করে না। যেকোনো বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্পের নগদ প্রবাহ ভবিষ্যৎ বছরগুলো থেকে আসে। যেহেতু আজকের ১ টাকা ভবিষ্যতের ১ টাকার সমান নয়, ভবিষ্যতে আগত নগদ প্রবাহের মূল্য সমান হয় না। কিন্তু গড় মুনাফার হার পদ্ধতি সব নগদ প্রবাহ সমমূল্যের বিবেচনা করে, এটি পদ্ধতিটির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। এখন আমরা উদাহরণের মাধ্যমে গড় মুনাফার প্রয়োগ সম্পর্কে পরিচিত হব।

উদাহরণ : মনে করো, তোমার বাবা ক এবং খ নামে দুটি বিনিয়োগ প্রকল্পে বিনিয়োগের চিন্তাভাবনা করছেন। প্রকল্প দুটির বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

প্রকল্প-ক : প্রকল্পের মেয়াদকাল ৩ বছর এবং প্রাথমিক মূলধন হিসেবে ১ কোটি টাকা দরকার। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করলে আগামী ৩ বছর প্রাক্কলিত বিক্রয় যথাক্রমে ৮ লক্ষ টাকা, ১৯৯ লক্ষ টাকা ও ৮০ লক্ষ টাকা এবং চলতি খরচ বিক্রয়ের ৪০ শতাংশ অনুমান করা হয়। অতএব, ৪০ শতাংশ হারে আগামী তিন বছর চলতি খরচ যথাক্রমে ৩.২০ লক্ষ, ৭৯.৬০ লক্ষ টাকা এবং ৩২ লক্ষ টাকা হয়। এর মধ্যে কাঁচামালের খরচ, শ্রমিকের মজুরি, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি আছে। এর পরে আসছে স্থায়ী খরচ। স্থায়ী খরচ উৎপাদন বা বিক্রয়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হবে না যেমন, বিল্ডিং ভাড়া। চলতি খরচের পাশাপাশি আগামী তিন বছরে প্রতিবছর ৫ লক্ষ টাকা করে স্থায়ী খরচ অনুমান করা হয়। এর পরে আসছে অবচয় ব্যয়। প্রত্যেক প্রকল্পে মেশিনপত্র বাবদ কিছু বিনিয়োগ করতে হয়। এই প্রকল্পে যে ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ দেখান হয়েছে, সেটা মেশিনপত্র বাবদ ব্যয়। এটা থেকেই অবচয় বের করতে হয়। বিনিয়োগের পরিমাণকে বিনিয়োগের আয়ুষ্কাল দিয়ে ভাগ করলে অবচয় পাওয়া যাবে। যেহেতু প্রকল্পটি থেকে বিক্রয় পাওয়া যাবে মাত্র ৩ বছর। সুতরাং প্রকল্পটির আয়ুষ্কাল মাত্র ৩ বছর। ১ কোটি টাকা বিনিয়োগকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রতিবছরের অবচয় দেখানো হয়েছে ৩৩.৩৩ লক্ষ টাকা। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে স্থায়ী ও চলতি ব্যয় এবং অবচয় বাদ দিয়ে করযোগ্য আয় বের করা যায়। ধরা যাক, করের হার ৩০ শতাংশ। প্রথম বছর লাভের বদলে ক্ষতি হচ্ছে ৩৩.৫৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটিতে ২য় ও ৩য় বছরে লাভ হবে যথাক্রমে প্রায় ৮১.০৭ ও ৯.৬৭ লক্ষ টাকা। এখানে লক্ষণীয় যে লাভ হলে যেমন ৩০ শতাংশ হারে কর বাদ দেওয়া হয় ১ম বছরের ক্ষতির উপরেও কর হিসাব করে ক্ষতি কমানো হবে।

যদি আমরা ধরে নিই যে, প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য প্রকল্প থেকে করযোগ্য আয় হয় এবং এই প্রকল্পে যদি ক্ষতি হয়, তবে প্রতিষ্ঠানটির সর্বমোট প্রদেয় কর একই হারে কমে যায়। এভাবে হিসাব করে ক-প্রকল্প থেকে তিন বছরে যে নিট মুনাফা প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা যথাক্রমে ১ম বছরে নিট ক্ষতি ২৩.৪৭ লক্ষ টাকা, ২য় বছরে নিট লাভ ৫৬.৭৫ লক্ষ টাকা ও ৩য় বছরে নিট লাভ ৬.৭৭ লক্ষ টাকা হবে। উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে 'ক' প্রকল্পের গড় মুনাফার হার নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায়।

প্রকল্প-ক

বিবরণ	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		
	বছর ১	**বছর ২**	**বছর ৩**
বিক্রয়	৮.০০	১৯৯.০০	৮০.০০
চলতি ব্যয় (বিক্রয়ের ৪০%)	(৩.২০)	(৭৯.৬০)	(৩২.০০)
স্থায়ী খরচ	(৫.০০)	(৫.০০)	(৫.০০)
অবচয়	(৩৩.৩৩)	(৩৩.৩৩)	(৩৩.৩৩)
করযোগ্য মুনাফা/ ক্ষতি	(৩৩.৫৩)	৮১.০৭	৯.৬৭
কর (৩০%)	(১০.০৬)	(২৪.৩২)	(২.৯০)
নিট মুনাফা বা ক্ষতি	(২৩.৪৭)	৫৬.৭৫	৬.৭৭

$$\text{এখানে, গড় মুনাফা} = \frac{-২৩.৪৭ + ৫৬.৭৫ + ৬.৭৭}{৩} \text{ লক্ষ টাকা} = ১৩.৩৫ \text{ লক্ষ টাকা}$$

$$\text{গড় বিনিয়োগ} = \frac{১০০ + ০}{২} \text{ লক্ষ টাকা} = ৫০ \text{ লক্ষ টাকা}$$

$$\text{গড় মুনাফার হার} = \frac{১৩.৩৫}{৫০} X ১০০ = ২৬.৭০\%$$

প্রকল্প-খ : প্রকল্প 'ক' এর ন্যায় প্রকল্প 'খ' এর আয়ুষ্কাল ৩ বছর এবং প্রাথমিক বিনিয়োগ ১ কোটি টাকা অনুমান করা হয়। আগামী তিন বছরে প্রকল্পটি থেকে যথাক্রমে ১৫১ লক্ষ টাকা, ১১০ লক্ষ টাকা এবং ৪৯ লক্ষ টাকা বিক্রয় পূর্বানুমান করা হয়। চলতি খরচ বিক্রয়ের ৩০ শতাংশ হারে প্রাক্কলন করা হয়। চলতি খরচের পাশাপাশি স্থায়ী খরচ বাবদ প্রতিবছর ২০ লক্ষ টাকা এবং অবচয় বাবদ প্রতিবছর ৩৩.৩৩ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প ক-এর ন্যায় প্রকল্প খ-এর কর হার ৩০% পূর্বানুমান করা হয়। উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে 'খ' প্রকল্পের গড় মুনাফা হার নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায়:

প্রকল্প-খ

বিবরণ	বছর ১ (লক্ষ টাকা)	বছর ২ (লক্ষ টাকা)	বছর ৩ (লক্ষ টাকা)
বিক্রয়	১৫১.০০	১১০.০০	৪৯.০০
চলতি খরচ (৩০%)	(৪৫.৩০)	(৩৩.০০)	(১৪.৭০)
স্থায়ী খরচ	(২০.০০)	(২০.০০)	(২০.০০)
অবচয়	(৩৩.৩৩)	(৩৩.৩৩)	(৩৩.৩৩)
করযোগ্য মুনাফা বা ক্ষতি	৫২.৩৭	২৩.৬৭	(১৯.০৩)
কর (৩০%)	(১৫.৭১)	(৭.১০)	(৫.৭১)
নিট মুনাফা	৩৬.৬৬	১৬.৫৭	(১৩.৩২)

এখানে,

$$\text{গড় মুনাফা} = \frac{৩৬.৬৬ + ১৬.৫৭ - ১৩.৩২}{৩} \text{ লক্ষ টাকা} = ১৩.৩০ \text{ লক্ষ টাকা}$$

$$\text{গড় বিনিয়োগ} = \frac{১০০ + ০}{২} \text{ লক্ষ টাকা} = ৫০ \text{ লক্ষ টাকা}$$

বি. দ্রঃ অবচয়ের পদ্ধতির কারণে মেয়াদ শেষে প্রকল্পের মূল্য শূন্য (০) হয়।

$$\text{সুতরাং, গড় মুনাফার হার} = \frac{১৩.৩০}{৫০} \times ১০০ = ২৬.৬০\%$$

লক্ষণীয় যে, দুটি প্রকল্পের গড় মুনাফার হার সমান নয়। এখানে 'ক' প্রকল্পের গড় মুনাফার হার ২৬.৭০% এবং 'খ' প্রকল্পের গড় মুনাফা ২৬.৬০%। তাহলে 'ক' প্রকল্পের গড় মুনাফার হার বেশি হওয়ায় তোমার বাবা 'ক' প্রকল্পে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

কাজ : ৫ বছর মেয়াদি ১টি প্রকল্পের প্রাথমিক বিনিয়োগ ৩ কোটি টাকা। প্রাক্কলিত বিক্রয় যথাক্রমে ৬০ লক্ষ টাকা, ২ কোটি টাকা, ১.৮ কোটি টাকা, ২.৪ কোটি টাকা ও ১.৬ কোটি টাকা। স্থির খরচ বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা, পরিবর্তনশীল খরচ বিক্রয়ের ৩৫% এবং কর হার ৩০%। প্রকল্পটির গড় মুনাফার হার নির্ণয় করো।

২. পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি

ব্যবসায় বা প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত টাকা কত দিনে ফেরত আসবে তা পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি নির্দেশ করে। পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বা প্রকল্প মূল্যায়নের একটি সহজ ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। ব্যবসায় বা প্রকল্প থেকে আগত প্রতি বছরের নগদ প্রবাহগুলো যদি সমান হয়, তবে বিনিয়োগকৃত টাকাকে বার্ষিক নগদ প্রবাহ দিয়ে ভাগ করলে পে-ব্যাক সময় নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ,

$$\text{পে-ব্যাক সময়} = \frac{\text{বিনিয়োগ}}{\text{বার্ষিক নগদ প্রবাহ}}$$

মনে করি, দর্জির দোকানির মেশিন কিনতে ১৫,০০০ টাকা প্রয়োজন। ক্রয়কৃত মেশিন ব্যবহার করে সে তার ব্যবসায় থেকে আগামী ৪ বছর বার্ষিক ৫০০০ টাকা নগদপ্রবাহ নিশ্চিত করতে পারবে। এক্ষেত্রে পে-ব্যাক সময় হবে :

$$\text{পে-ব্যাক সময়} = \frac{১৫,০০০}{৫,০০০}$$
$$= ৩ \text{ বছর}$$

ব্যবসায় বা প্রকল্প থেকে আগত নগদপ্রবাহ অনেক সময় সমান নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ ব্যবহার করে পে-ব্যাক সময় নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ, নগদ প্রবাহগুলোকে ক্রমান্বয়ে যোগ করা হয়। তারপর নিম্নের উদাহরণে ব্যবহৃত ফর্মুলা অনুযায়ী পে-ব্যাক সময় নির্ণয় করা হয়।

গড় মুনাফার হার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উদাহরণে 'ক' প্রকল্পের ৩ বছরের নিট মুনাফা যথাক্রমে (২৩.৪৭) লক্ষ টাকা, ৫৬.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ৬.৭৭ লক্ষ টাকা। পে-ব্যাক সময় এবং মূলধন বাজেটিং-এর অন্যান্য পদ্ধতিতে মুনাফার পরিবর্তে নগদ প্রবাহ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত নিট মুনাফার সাথে অবচয় যোগ করলে নগদ প্রবাহ পাওয়া যায়। অতএব, পূর্বের উদাহরণে বর্ণিত প্রকল্প 'ক'-এর নির্ণীত নিট মুনাফার সাথে অবচয় যোগ করে নিম্নরূপে নগদ প্রবাহ নির্ণয় করা যায়।

বিবরণ	বছর ১ (লক্ষ টাকায়)	বছর ২ (লক্ষ টাকায়)	বছর ৩ (লক্ষ টাকায়)
নিট মুনাফা যোগ: অবচয়	(২৩.৪৭) ৩৩.৩৩	৫৬.৭৫ ৩৩.৩৩	৬.৭৭ ৩৩.৩৩
নগদ প্রবাহ (প্রায়)	১০	৯০	৪০

বি.দ্র: নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে দশমিক পরিহার করা হয়েছে।

উপরের সারণিতে নির্ণীত নগদ প্রবাহ ব্যবহার করে প্রকল্পটির পে-ব্যাক সময় হবে নিম্নরূপ।

বছর	বার্ষিক নগদ প্রবাহ (লক্ষ টাকায়)	ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ (লক্ষ টাকায়)
০	-১০০	- ১০০
১	১০	-৯০
২	৯০	০
৩	৪০	৪০

উপরের ছক থেকে লক্ষণীয় যে প্রথম দুই বছরে বিনিয়োগকৃত টাকা পুরোটা ফেরত আসে। ফলে প্রকল্পের পে-ব্যাক সময় হবে ২ বছর।

আবার গড় মুনাফার হার পদ্ধতিতে প্রকল্প 'খ'-এর নির্ণীত নিট মুনাফার সাথে অবচয় যোগ করলে প্রকল্প 'খ'-এর নগদ প্রবাহ পাওয়া যাবে।

বিবরণ	বছর ১ (লক্ষ টাকায়)	বছর ২ (লক্ষ টাকায়)	বছর ৩ (লক্ষ টাকায়)
নিট মুনাফা	৩৬.৬৬	১৬.৫৭	(১৩.৩২)
যোগ অবচয়	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩
নগদ প্রবাহ (প্রায়)	৭০	৫০	২০

বি.দ্র: নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে দশমিক পরিহার করা হয়েছে।

সারণিতে নির্ণীত নগদ প্রবাহ ব্যবহার করে প্রকল্প 'খ'-এর পে-ব্যাক সময় নিম্নরূপে নির্ণয় করা যায়।

বছর	বার্ষিক নগদ প্রবাহ (লক্ষ টাকায়)	ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ (লক্ষ টাকায়)
০	-১০০	-১০০
১	৭০	-৩০
২	৫০	২০
৩	২০	৪০

উপরে ছক থেকে লক্ষণীয় যে, প্রথম বছরে বিনিয়োগকৃত টাকার ৭০ লক্ষ টাকা ফেরত আসে। দ্বিতীয় বছরের নগদ প্রবাহ হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা কিন্তু প্রারম্ভিক বিনিয়োগ ফেরত পেতে মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা দরকার। অতএব ৩০ লক্ষ টাকা ফেরত আসতে সময় দরকার $\frac{৩০}{৫০} = ০.৬$ বছর। অতএব, পে-ব্যাক সময় ১.৬ বছর। নিচে সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হলো :

$$\text{পে-ব্যাক সময়} = ১ \text{ বছর} + \frac{৩০}{৫০} \text{ বছর}$$
$$= (১ + ০.৬) \text{ বছর}$$
$$= ১.৬ \text{ বছর}$$

সিদ্ধান্ত নীতি

পে-ব্যাক সময় পদ্ধতিতে, যে প্রকল্পের পে-ব্যাক সময় যত কম, সে প্রকল্পটি তত গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে যে প্রকল্পের পে-ব্যাক সময় যত বেশি, সে প্রকল্পটি তত বেশি অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

আবার যদি প্রতিষ্ঠানের হাতে এক বা একাধিক বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্প থাকে তাহলে বিনিয়োগ সুযোগগুলোকে বা প্রকল্পগুলোকে পে-ব্যাক সময় অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানের তহবিলের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং অবশিষ্টগুলোকে বাতিল করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত পে-ব্যাক সময় নির্ধারণ করে থাকে। কোম্পানির কর্মকর্তারা বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ বিনিয়োগের ধরন (স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয়, ব্যবসার সম্প্রসারণ, উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিস্থাপন বা আধুনিকায়ন), বিনিয়োগ বা প্রকল্প ঝুঁকি এবং অন্যান্য বিষয় চিন্তাভাবনা করে এটি নির্ধারণ করেন।

পে-ব্যাক সময় পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি মূলধন বাজেটিং-এর সবচেয়ে সরল ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। এর জনপ্রিয়তার কারণ প্রথমত : এই পদ্ধতি সহজবোধ্য ও সহজ। তবে এর কিছু অসুবিধাও আছে। এখানে কিছু অসুবিধা তুলে ধরা হলো।

১. পে-ব্যাক সময় মূলত কোনো লাভের হার নয়। এটা একটি সময়কাল, যখন বিনিয়োজিত মূলধন ফেরত আসবে বলে আশা করা হয়। পে-ব্যাক সময়কাল অতিবাহিত হলে প্রতিষ্ঠানটির কোনো লাভ হবে না প্রতিষ্ঠানটি কেবল ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

২. যদি দুই বা ততোধিক প্রকল্প থাকে, তবে যার পে-ব্যাক কাল কমঃ তা গ্রহণ করা হয় যদি একটি প্রকল্প থাকে তাহলে এটি গ্রহণযোগ্য কি না তা এই পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

৩. পে-ব্যাক কালের বাইরের নগদ প্রবাহ গণনা করা হয় না। উপরের প্রকল্প ক-তে পে-ব্যাক ছিল ২ বছর। এমতাবস্থায় ৩য় বছরে যদি প্রকল্পটি একটি বিশাল অঙ্কের নগদ প্রবাহ দেয়, তবুও পে-ব্যাক কাল ২ বছরই থাকবে।

৪. পে-ব্যাক অর্থের সময়মূল্য বিবেচনা করে না। অর্থের সময়মূল্য অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, আগামী বছরের ১০০ টাকা ৫ বছর পরের ১০০ টাকা থেকে অধিকতর মূল্যবান, কিন্তু পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি অর্থের সময়মূল্য বিবেচনা করে না। এখানে আগামী বছরের ১০০ টাকা এবং ৫ বছর পরের ১০০ টাকা সমান মূল্যবান মনে করা হয়। এটি একটি সমস্যা।

কাজ-১ : মনে করো, তোমার বাবা একটি প্রকল্পে ৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগের চিন্তা করছেন, যা থেকে আগামী ৬ বছর যথাক্রমে ১০,০০০ টাকা, ১৫,০০০ টাকা ২০,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা, ২০,০০০ এবং ৩০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। প্রকল্পটির পে-ব্যাক সময় নির্ণয় করো।

এ অধ্যায়ে তোমরা গড় মুনাফার হার পদ্ধতি এবং পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছ। তবে মূলধন বাজেটিং পদ্ধতিগুলোর মধ্যে উল্লিখিত দুটি পদ্ধতির তুলনায় নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি ও অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার পদ্ধতি বহুল প্রচলিত হিসাবে স্বীকৃত। বিশেষ করে অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করে বিধায় পদ্ধতি দুটি অনেকের কাছে জনপ্রিয়। পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে তোমরা পদ্ধতি দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি বিনিয়োগের একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া?

ক. মূলধন বাজেটিং
খ. অর্থের সময়মূল্য
গ. বাট্টার হার নির্ধারণ
ঘ. বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ মূল্যনীতি

২. পে-ব্যাক সময় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

ক. $\frac{\text{বার্ষিক নগদ প্রবাহ}}{\text{বিনিয়োগ}}$
খ. $\frac{\text{বিনিয়োগ}}{\text{বার্ষিক নগদ প্রবাহ}}$
গ. $\frac{\text{বিনিয়োগ}}{\text{বার্ষিক নগদ আন্তঃপ্রবাহ}}$
ঘ. $\frac{\text{বার্ষিক নগদ বহিঃপ্রবাহ}}{\text{বার্ষিক নগদ আন্তঃপ্রবাহ}}$

৩. নগদ প্রবাহ ও নিট মুনাফার ব্যবধানকে কী বলা হয়?

ক. প্রারম্ভিক বিনিয়োগ
খ. নগদ বহিঃপ্রবাহ
গ. মোট চলতি ব্যয়
ঘ. মোট অবচয়

৪. বাজেটিং-এর

ক. প্রকল্প নির্বাচন
খ. প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ
গ. বিনিয়োগের লাভজনকতা নির্ণয়
ঘ. প্রকল্পের মুনাফার হার নির্ণয়

৫. ডা. শামীমা নিজস্ব অর্থায়নে একটি হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা করেন। মূলধন বাজেটিংয়ের সাহায্যে তিনি নিচের কোন সিদ্ধান্ত নেবেন?

ক. রোগীর ওষুধ ক্রয়
খ. এক্স-রে মেশিন ক্রয়
গ. ওষুধের মূল্য নির্ধারণ
ঘ. হাসপাতাল ভবনের রং পরিবর্তন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সিমান্ত কোম্পানির প্রধান নির্বাহী মিসেস বর্ণা একটি নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের লাভজনকতা নির্ণয় করতে চান। তাই তিনি পর পর ৪ বছরের মুনাফার সাথে অবচয় যোগ না করেই মোট মুনাফাকে ৪ দ্বারা ভাগ করেন, কিন্তু মোট বিনিয়োগকে ২ দ্বারা ভাগ করেন।

৬. মিসেস বর্ণার অনুসৃত পদ্ধতি কোনটি?

ক. গড় মুনাফা হার
খ. পে-ব্যাক সময়
গ. নিট বর্তমান মূল্য
ঘ. অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার

৭. উদ্দীপকে নির্দেশিত পদ্ধতিটির সীমাবদ্ধতা হলো–

i. অর্থের সময় মূল্য উপেক্ষিত
ii. সকল নগদ প্রবাহের মূল্য সমান

iii. মুনাফা ও বিনিয়োগকে ভিন্ন সংখ্যা দ্বারা ভাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত কী?

২. মূলধন বাজেটিং কী?

৩. নগদ আন্তঃপ্রবাহ কী?

৪. নগদ বহিঃপ্রবাহ কী?

৫. গড় মুনাফার হার পদ্ধতি কী?

৬.পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি কী?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শতদল কোম্পানি সর্বদাই মূলধন বাজেটিং-এর অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে প্রকল্পের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সম্প্রতি উক্ত কোম্পানি এর সমবিনিয়োগের দুটি প্রকল্প 'দিবা' ও 'নিশি '-এর পে-ব্যাক সময় নির্ণয় করতে গিয়ে ৩য় বছরে ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ যথাক্রমে ০ ও -১০ পেল। ৪র্থ বছরে উভয় প্রকল্পের নগদ প্রবাহ ২০।

ক. মূলধন বাজেটিং-এর ব্যর্থতার দায়ভার নিতে হয় কাকে?

খ. নগদ আন্তঃপ্রবাহ ও নিট মুনাফার পার্থক্য নির্ণয়কারী উপাদানটি ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপক হতে প্রকল্প 'নিশি'-এর পে-ব্যাক সময় নির্ণয় করো।

ঘ. দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য শতদল কোম্পানির কোন প্রকল্পটি বেছে নেওয়া উচিত?

২. শ্যাম্পু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'স্যাম্পী লি.' ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা, রুচি, প্রভৃতি বিবেচনা করে বড় সাইজের বোতলের পাশাপাশি মিনি প্যাক, মাঝারি প্যাক ও ক্ষুদ্রাকৃতির বিকল্প কন্ডিশনার তৈরির জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে চায়। আয়-ব্যয় প্রাক্কলন করে দেখা যায় ৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পে প্রাথমিক বিনিয়োগ ৫ কোটি টাকা এবং বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৯০ লক্ষ, ২.৪ কোটি, ৩ কোটি, ২.৫ কোটি ও ১.৬ কোটি টাকা। অন্যান্য চলতি খরচ বিক্রয়ের ৩০% এবং কর ২৫%।

ক. মূলধন বাজেটিং প্রক্রিয়ায় বাট্টা হার হিসেবে ব্যবহার হয় কোনটি?

খ. মূলধন বাজেটিং অনুমাননির্ভর কেন?

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রকল্পটির গড় মুনাফার হার নির্ণয় করো।

ঘ. 'স্যাম্পী লি.' কোম্পানির বিনিয়োগ ক্ষেত্রটির জন্য মূলধন বাজেটিং-এর গুরুত্ব মূল্যায়ন করো।

সপ্তম অধ্যায়

মূলধন ব্যয়

Cost of Capital

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মূলধন ব্যয় থাকে। মূলধন ব্যয় বলতে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিলের ব্যয় বোঝায়। সাধারণত তহবিলের জোগানদাতাদের প্রত্যাশিত আয় প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন ব্যয় হিসেবে গণ্য হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান করে। তহবিলের বিভিন্ন উৎসের মূলধন ব্যয় সমান হয় না। ফলে প্রতিটি উৎসের পৃথকভাবে মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। এ অধ্যায়ে আমরা মূলধন ব্যয়, মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের গুরুত্ব, তহবিলের বিভিন্ন উৎসের মূলধন ব্যয় নির্ণয় এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

A/c Payee Only

প্যাসিফিক জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ
PACIFIC GENERAL INSURANCE CO. LTD.

Warrant Number 1100375

Date: 0 2 0 8 2 0 1 2

(This Dividend Warrant is valid for six months from the date of issue unless revalidated)

DIVIDEND WARRANT-2011

FOLIO/BO ID NO.: 12015700000

Pay to Mr. A B C

The sum of Taka TWO THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONLY

Taka **2,250.00**

Payable at B Bank Limited
Any Branch

Routing No.: 085273881
Account No.: 201.150.2619

Authorized Signatory

Authorized Signatory

ছবি: ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- মূলধন ব্যয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মূলধন খরচ নির্ণয় করতে পারব।
- মূলধন খরচের ভিত্তিতে বিভিন্ন উৎসের মূল্যায়ন করতে পারব।

৭.১ ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত তিন বন্ধু যথা রহিমের ফ্রিজ কেনা, করিমের সেলাই মেশিন কেনা এবং শংকরের হুইল চেয়ার ও চুল কাটার মেশিন কেনার বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এসব বিনিয়োগের অর্থায়ন করতে হয়। তোমরা জেনেছ যে অর্থায়নের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। যেমন: মালিকের নিজের মূলধন, বন্ধুবান্ধব থেকে ধার, ব্যাংক ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ ইত্যাদি। এরূপ প্রতিটি উৎস থেকে অর্থ সরবরাহকারীদের একটি প্রত্যাশিত আয় থাকে। এখানে তহবিল সরবরাহকারীর জন্য যেটি প্রত্যাশিত আয়, সেটি তহবিল সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন খরচ হিসেবে পরিগণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, রহিম যদি ফ্রিজ কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ১৫% সুদের হারে ঋণ নেয়, তাহলে তার মূলধন খরচ হবে ১৫%। অনুরূপভাবে করিম সেলাই মেশিন কেনার টাকা তার নিজের থেকে সংস্থান করলে, উক্ত অর্থের সুযোগ ব্যয় হবে তার মূলধন খরচ। অর্থাৎ সে যদি উক্ত অর্থ অন্য কোথাও বিনিয়োগ করে ১৫% আয় অর্জন করতে পারত বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে তার মূলধন খরচ হবে ১৫%।

বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাদের বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল এক বা একাধিক উৎস থেকে সংস্থান করে। এক্ষেত্রে সবগুলো উৎসের মূলধন খরচের গড় হার উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য মূলধন খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে। মনে করো,কোনো একটি কোম্পানির বিনিয়োগের জন্য ১০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানটি এই ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে এবং ৫ লক্ষ টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শেয়ার মালিকরা তাদের বিনিয়োগ থেকে ১৮% আয় প্রত্যাশা করে এবং ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে ১২% সুদের হারে ঋণ দিতে সম্মত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের জন্য শেয়ার বিক্রি উৎসের মূলধন খরচ হবে ১৮% এবং ব্যাংক ঋণ উৎসের মূলধন খরচ হবে ১২%। দুটি উৎসের মূলধন খরচকে গড় করলে প্রাপ্ত হারটি অর্থাৎ (১৮%×.৫০+১২%×.৫০)=১৫% উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য গড় মূলধন খরচ হিসেবে পরিগণিত হবে। এখানে উল্লেখ্য, যেহেতু প্রতিষ্ঠানটির মূলধন খরচ ১৫% প্রতিষ্ঠানটিকে তার বিনিয়োগ থেকে তহবিলের খরচ হিসাবভুক্ত করার পূর্বে ন্যূনতম ১৫% আয় অর্জন করতে হবে, নতুবা প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত আয় এবং ব্যাংকের প্রত্যাশিত আয় মেটাতে পারবে না। অতএব বলা যায়, বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিলের মালিকদের প্রত্যাশিত আয় মেটাতে প্রতিষ্ঠানকে তার বিনিয়োগের উপর সর্বনিম্ন যে হারে আয় প্রয়োজন, সে হারকে তহবিলের খরচ (Cost of Fund) বলা হয়।

৭.২ মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের তাৎপর্য

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূলধন খরচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে অর্থায়নের সঠিক উৎস বেছে নেয়া থেকে শুরু করে বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্পের মূল্যায়ন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে মূলধন খরচ প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে মূলধন খরচের তাৎপর্য আলোকপাত করা হলো।

প্রথমত : বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত-সংক্রান্ত। ধরা যাক, একটি প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংক থেকে ১৮% সুদের হারে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে একটি কারখানা দেয়। কারখানাটি চালু করার পর দেখা গেল প্রতিষ্ঠানটি ১০% হারে আয় করতে পারছে, যা সোনালী ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ ১৮% সুদের হার থেকে কম। ফলে প্রতিষ্ঠানটি সোনালী ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি ব্যর্থ হবে।

সুতরাং তহবিলের খরচ জেনে তা অপেক্ষা বেশি আয় করা সম্ভব–এমন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক। অতএব বলা যায়, সঠিক তহবিলের খরচ নির্ণয় সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয়ত: মূলধন কাঠামো-সংক্রান্ত। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একটি কাম্য ঋণনীতি থাকে। কাম্য ঋণনীতি বলতে প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনে কত অংশ ধার বা ঋণ থেকে সংগ্রহ করা হয় তাকে বুঝায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মালিকদের ইক্যুইটি অংশকেই মোট মূলধন বলে। একটি প্রতিষ্ঠান তার মোট মূলধনের ৫০% নিজস্ব মূলধন বা ইক্যুইটি এবং ৫০% ঋণ অথবা ৬০% নিজস্ব মূলধন বা ইক্যুইটি এবং ৪০% ঋণ অথবা ৪০% নিজস্ব মূলধন এবং ৬০% ঋণ, এরূপ যেকোনো অনুপাতে সংগ্রহ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানকে এরূপ প্রতিটি অনুপাতের মূলধন কাঠামোর খরচ নির্ণয় করতে হয় এবং যে বিকল্প অনুপাতে মূলধন খরচ সর্বনিম্ন হয়, সে মূলধন কাঠামো গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অতএব, ব্যবসায়ে সঠিক মূলধন কাঠামো নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও মূলধন ব্যয় তাৎপর্য বহন করে।

৭.৩ মূলধন ব্যয় নির্ণয়

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস থেকে সংগ্রহ করে। এসব দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ মূলধন, অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন, সাধারণ শেয়ার মূলধন এবং সংরক্ষিত আয় অন্যতম। একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এ চারটি উৎসের মধ্যে থেকে সংগ্রহ করে। এরূপ প্রতিটি উৎস থেকে অর্থ সরবরাহকারী বা বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত আয় এবং ঝুঁকির ধরনে ভিন্নতা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ঋণ মূলধন সরবরাহকারীদের প্রত্যাশিত আয় এবং সাধারণ শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত আয় সমান হয় না। যেহেতু বিনিয়োগকারী বা অর্থ সরবরাহকারীদের প্রত্যাশিত আয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন খরচ হিসেবে গণ্য হয়, সেহেতু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের বিভিন্ন উৎসে মূলধন খরচের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মূলধন খরচের এই ভিন্নতা অর্থ বিনিয়োগকারী বা সরবরাহকারীদের প্রত্যাশিত আয়ের হারের ভিন্নতা এবং ঝুঁকির ধরনের ভিন্নতাকে নির্দেশ করে। সাধারণত অর্থ সরবরাহকারীরা তাদের বিনিয়োগকে যত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ মনে করবে, তাদের প্রত্যাশিত আয়ের হারও তত বেশি হবে। এবার বিভিন্ন উৎসের মূলধন ব্যয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হবে।

ক. ঋণ মূলধন ব্যয়

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান সাধারণত এক বা একাধিক উৎস থেকে ব্যবসায়ের জন্য ঋণ সংগ্রহ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেমন: মুদির দোকান, চুল কাটার সেলুন, ঔষধের দোকান ইত্যাদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঋণ মূলধনের প্রধান উৎস হচ্ছে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণ। আবার বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের পাশাপাশি বন্ড বা ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে অর্থের সংস্থান করে থাকে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে মূলধনের সংস্থান করলে ঋণ মূলধন ব্যয় নির্ণয় খুব সহজ। এক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত সুদের হার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন ব্যয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

মনে কর, সোনালী ব্যাংক মুদির দোকানিকে ১০ লক্ষ টাকা ১৫% হার সুদে ঋণ দিতে সম্মত হয়। এক্ষেত্রে মুদির দোকানির ঋণ মূলধন ব্যয় হবে ১৫ শতাংশ। তবে এই হার প্রতিষ্ঠানের জন্য কর পূর্ব-মূলধন ব্যয় হিসেবে পরিগণিত হয়। উল্লেখ্য, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাধারণত ঋণ মূলধন বাবদ যে পরিমাণ সুদ পরিশোধ করে, তা কর-পূর্ব মুনাফা থেকে বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের করযোগ্য মুনাফা নির্ধারণ করা হয়। ফলে কোম্পানিকে কম কর দিতে হয়। তাই ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধা নিয়ে আসে। এ সুবিধা বিবেচনা করে কর-পূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয়কে সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়। নিম্নে বর্ণিত সূত্রের মাধ্যমে কর-পূর্ব ঋণ ব্যয়কে সমন্বয় করা হয়।

কর-সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ = ঋণের সুদের হার (১ - কর হার) × ১০০

$$\text{বা, } k_d = I\,(1-T) \times ১০০$$

মুদির দোকানির ঋণের সুদের হার ১৫% কে ৩০% করহার দিয়ে সমন্বয় করলে কর-সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ হবে নিম্নরূপ:

$$\text{কর-সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ } (k_d) = I\,(1-T) \times ১০০$$
$$= ১৫\%\,(১ - .৩০) \times ১০০$$
$$= ০.১৫ \times .৭০ \times ১০০$$
$$= ১০.৫০\%$$

কাজ : ব্যাংক থেকে ৯% হার সুদে ঋণ নিয়ে মূলধন সংগ্রহ করলে ঋণ মূলধনের ব্যয় কত হবে যদি কর হার ৪০% হয়।

খ. অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়

অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ধারণ ঋণ মূলধনের ব্যয় নির্ধারণ থেকে আলাদা। কারণ ঋণ মূলধন এবং অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। প্রতিষ্ঠানকে ঋণ মূলধন সরবরাহকারীরা সাধারণত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদ পেয়ে থাকে। অন্যদিকে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকরা নির্দিষ্ট হারে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। তবে কোম্পানি সবসময় অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ দিতে বাধ্য থাকে না। তবে কোম্পানি লভ্যাংশ দিতে বাধ্য না থাকলেও পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করলে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ দিয়ে থাকে। অতএব বলা যায়, অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ভর করে শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশের উপর।

অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশ এবং শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের অনুপাত নির্ণয় করলে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় পাওয়া যায়। সূত্রের সাহায্যে নিম্নরূপে নির্ণয় করা যায়:

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় } (k_p) = \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০$$

$$\text{বা, } k_p = \frac{D_p}{P_o} \times ১০০$$

উদাহরণ : একটি কোম্পানি ১,০০০ টাকা লিখিত মূল্যের ১০ শতাংশ অগ্রাধিকার শেয়ার বাজারে বিক্রির চিন্তা করছে। প্রতিটি শেয়ার বিক্রি থেকে কোম্পানি ৮২০ টাকা পাওয়ার প্রত্যাশা করে। বর্ণিত তথ্যাদি ব্যবহার করে উক্ত শেয়ারের ব্যয় নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায়:

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{১০০}{৮২০} \times ১০০ \quad \left\{\text{নোট: } \frac{\text{১০০০ এর ১০\%}}{\text{প্রতি শেয়ারের বিক্রয় মূল্য}}\right\}$$
$$= ১২.২০\%$$

> **কাজ :** একটি কোম্পানি ৮ শতাংশ অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে। প্রতিটি শেয়ারের লিখিত মূল্য ১০০ টাকা এবং বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ৯০ টাকা হলে, অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ধারণ করো।

গ. সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়

তোমরা জেনেছ যে বাজারে সাধারণ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কোম্পানি তার মূলধনের সংস্থান করে। আবার কোম্পানি ব্যবসায়ের পুঞ্জীভূত মুনাফা থেকে অর্থের সংস্থান করতে পারে। উল্লেখ্য,পুঞ্জীভূত মুনাফা, অবন্টিত মুনাফা এবং সংরক্ষিত তহবিল একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থের অন্যান্য উৎস থেকে সাধারণ শেয়ার মূলধনের পার্থক্য আছে। প্রথমত, অন্যান্য উৎসের ন্যায় কোম্পানি ইক্যুইটি মূলধনের উপর সবসময় লভ্যাংশ দিতে বাধ্য থাকে না। দ্বিতীয়ত, লভ্যাংশ দিলেও প্রদত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ বা হার সবসময় সমান থাকে না। এসব কারণে সাধারণ শেয়ার মূলধনের ব্যয় নির্ধারণ অন্যান্য উৎসের ব্যয় নির্ধারণ থেকে আলাদা হয়ে থাকে।

কোম্পানির শেয়ার মালিকরা সাধারণত লভ্যাংশ এবং শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি থেকে লাভপ্রাপ্তির আশায় শেয়ার কেনে। ফলে শেয়ার মূলধনের ব্যয় বলতে বিনিয়োগকারীদের বা শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ এবং শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিজনিত লাভ থেকে প্রত্যাশিত আয়ের হারকে বোঝানো হয়।

সাধারণ শেয়ার মূলধনের ব্যয় নির্ণয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ নির্ধারণ করা জটিল কাজ যেহেতু লভ্যাংশ হার অগ্রাধিকার শেয়ারের মতো নির্দিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে কোম্পানির আয় এবং লভ্যাংশ বৃদ্ধির হার অনুমান করা আরেকটি জটিল কাজ।

এসব জটিলতার কারণে সাধারণ শেয়ার মূলধনের ব্যয় নির্ধারণের একক কোনো পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন অনুমানের উপর ভিত্তি করে মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। নিম্নে সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের সহজ দুটি পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি

এটি সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের একটি সহজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মনে করা হয় কোম্পানি বর্তমান বছরে যে লভ্যাংশ দিয়েছে, ভবিষ্যৎ বছরগুলোতেও সমপরিমাণ লভ্যাংশ ঘোষণা করবে। অর্থাৎ শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশের কোনো পরিবর্তন হবে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি কোম্পানি এ বছর প্রতি শেয়ারে ১০ টাকা লভ্যাংশ দিলে আগামী বছরগুলোতেও কোম্পানি শেয়ার মালিকদের ১০ টাকা করে লভ্যাংশ দেবে বলে অনুমান করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতি শেয়ারে প্রদত্ত লভ্যাংশকে শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য দিয়ে ভাগ করলে সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় পাওয়া যায়। সূত্রের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হলো :

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় } (k_e) = \frac{\text{লভ্যাংশ}_১}{\text{শেয়ার মূল্য}_০} \times ১০০$$

$$\text{বা, } (k_e) = \frac{D_1}{P_0} \times ১০০$$

এখানে $\text{লভ্যাংশ}_১$ = বছরের শেষে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ

$\text{শেয়ার মূল্য}_০$ = শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য

উদাহরণ : একটি কোম্পানির শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য ১১০ টাকা। প্রতিষ্ঠানটি এ বছর প্রতি শেয়ারে ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করে। কোম্পানির সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নিম্নরূপ নির্ণয় করা যায়:

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \frac{১০}{১১০} \times ১০০$$
$$= ০.০৯০৯ \times ১০০$$
$$= ৯.০৯\%$$

> **কাজ :** পদ্মা লিমিটেডের প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য ২০ টাকা। কোম্পানি এ বছর সাধারণ শেয়ারে ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করে যা ভবিষ্যতেও একই রাখার সিদ্ধান্ত হয়। সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয় করো।

স্থিরহারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি

ভবিষ্যতে বছরগুলোতে লভ্যাংশের কোনো পরিবর্তন হয় না এমন কোম্পানি বাস্তবে কম দেখা যায়। সাধারণত কোম্পানিগুলো একেক বছর বিভিন্ন হারে লভ্যাংশ দিয়ে থাকে। স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি এমনি একটি পদ্ধতি। যাতে ধরে নেয়া হয় যে কোম্পানি প্রতিবছর সমপরিমাণ লভ্যাংশ দেয় না। তবে এ পদ্ধতির কিছু অনুমিত শর্তাবলি রয়েছে।

শর্তাবলিতে ধরে নেওয়া হয়, কোম্পানির লভ্যাংশ প্রতিবছর বৃদ্ধি পাবে এবং এই বৃদ্ধির হার প্রতিবছর একই পরিমাণ থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোম্পানি যদি বর্তমান বছর ১০ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করে এবং কোম্পানিটির অনুমিত লভ্যাংশ বৃদ্ধির হার যদি ১০% হয়, তবে

১ বছর পর প্রত্যাশিত লভ্যাংশ হবে ১০ (১+০.১০) = ১১ টাকা
২ বছর পর প্রত্যাশিত লভ্যাংশ হবে ১১ (১+০.১০) = ১২.১ টাকা
৩ বছর পর প্রত্যাশিত লভ্যাংশ হবে ১২.১ (১+০.১০) = ১৩.৩১ টাকা
এভাবে প্রতিবছর প্রত্যাশিত লভ্যাংশ ১০% হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সূত্রের মাধ্যমে স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতিতে সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নিম্নরূপে নির্ণয় করা যায়:

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় } (k_e) = \left\{ \frac{\text{লভ্যাংশ}_১}{\text{শেয়ার মূল্য}_০} + \text{বৃদ্ধির হার} \right\} \times ১০০$$

$$\text{বা, } k_e = \left\{ \frac{D_1}{P_0} + g \right\} \times ১০০ \text{ এবং } D_1 = D_0 (1+g)$$

এখানে $\text{লভ্যাংশ}_১$ = $\text{লভ্যাংশ}_০$ (১+ বৃদ্ধির হার)
$\text{লভ্যাংশ}_০$ = বর্তমান বছরের লভ্যাংশ
$\text{শেয়ার মূল্য}_০$ = শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য
বৃদ্ধির হার = লভ্যাংশ বৃদ্ধির হার।

উদাহরণ : একটি কোম্পানি সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয় করতে চায়। কোম্পানির শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য ১৫০ টাকা। কোম্পানিটি সদ্য সমাপ্ত বছরে প্রতি শেয়ারে ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেয়। অতীত রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায় কোম্পানির লভ্যাংশ গড়ে ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায়:

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \left\{\frac{\text{লভ্যাংশ}_{১}}{\text{শেয়ার মূল্য}_{০}} + \text{বৃদ্ধির হার}\right\} \times ১০০$$

$$= \left\{\frac{১৫.৭৫}{১৫০} + .০৫\right\} \times ১০০$$

$$= ১৫.৫\%$$

এখানে,

$$\text{লভ্যাংশ}_{১} = \text{লভ্যাংশ}_{০}\ (১+\text{বৃদ্ধির হার})$$
$$= ১৫\ (১+০.০৫)$$
$$= ১৫.৭৫$$

> **কাজ :** একটি কোম্পানি বর্তমান বছরের শেষে শেয়ার প্রতি ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করে এবং অতীতের তুলনায় লভ্যাংশ ১০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানির শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য ১২৫ টাকা হলে, মূলধন ব্যয় নির্ণয় করো।

ঘ. সংরক্ষিত আয়ের ব্যয়

কোম্পানির অর্থায়নের অন্যতম একটি উৎস হচ্ছে সংরক্ষিত আয়। কোম্পানি প্রতিবছর যে পরিমাণ টাকা মুনাফা হিসেবে অর্জন করে, সেটির পুরোটা শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন না করে কিছু অংশ প্রতিষ্ঠানে রেখে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি কোম্পানি কোনো বছরে ৫০ লক্ষ টাকা মুনাফা করলে এবং উক্ত মুনাফা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ে রেখে দিলে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ের সংরক্ষিত আয় হিসেবে গণ্য হবে। এভাবে সংরক্ষিত আয় থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন বিনিয়োগ সুযোগ বা প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়। সংরক্ষিত আয় থেকে অর্থায়ন করা হয় বলে অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে সংরক্ষিত আয়ের কোনো ব্যয় নেই। কিন্তু এ ধারণাটি ভুল। কারণ, এ সংরক্ষিত আয়ের আপাতদৃষ্টিতে বাহ্যিক কোনো ব্যয় না থাকলেও এর একটি সুযোগ-ব্যয় রয়েছে।

সংরক্ষিত আয়ের সুযোগ ব্যয় বোঝার আগে সুযোগ-ব্যয়ের সাধারণ ধারণা বোঝা দরকার। মনে করো, তোমার বাবার কোনো একটি ব্যাংকে ১০ লক্ষ টাকা জমা আছে। তোমার ভাইয়া তোমার বাবাকে একদিন বলল, বাবা, তোমার একাউন্টে যে ১০ লক্ষ টাকা পড়ে আছে, সেটা আমাকে দাও, আমি ব্যবসা করব। তোমার ভাইয়ার এ কথাটি ঠিক নয়। কারণ টাকাটা আসলে অলস পড়ে নেই, ব্যাংক এই ১০ লক্ষ টাকার উপর একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করবে। ফলে তোমার বাবা যদি তোমার ভাইয়াকে টাকাটা দিয়ে দেন, তাহলে সুদ বাবদ যে আয় হতো, সেটা পাবেন না। ফলে সুদ বাবদ আয় না পাওয়াটা তোমার ভাইয়াকে ব্যবসায়ের কাজে টাকা দেওয়ার একটি সুযোগ-ব্যয়।

অনুরূপভাবে কোম্পানির আয় শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন না করে রেখে দিলে শেয়ার মালিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে এর একটি সুযোগ-ব্যয় থাকে। কোম্পানির অর্জিত মুনাফা কোম্পানিতে সংরক্ষিত আয় হিসেবে না রেখে শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করলে শেয়ার মালিকরা সেই অর্থ অন্যত্র বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত আয় করতে পারত। ফলে কোম্পানি অর্জিত মুনাফা বা আয় বণ্টন না করলে শেয়ার মালিকরা উক্ত অর্থের অন্যত্র বিনিয়োগে প্রাপ্ত আয় থেকে বঞ্চিত হয়। এখানে অর্থের অন্যত্র বিনিয়োগে প্রাপ্ত আয় থেকে বঞ্চিত

হওয়াটাকে সংরক্ষিত আয়ের সুযোগ-ব্যয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোম্পানি অর্জিত মুনাফার পুরোটাই শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করলে এবং শেয়ার মালিকরা সেই অর্থ অন্যত্র বিনিয়োগ করে ১৫ শতাংশ হারে আয় করতে পারলে ১৫ শতাংশ হবে কোম্পানির সংরক্ষিত আয়ের সুযোগ-ব্যয়।

৭.৪ গড় মূলধনি ব্যয় (Weighted Average Cost of Capital- WACC)

উপরের পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে আমরা জানলাম যে মূলধনের বিভিন্ন উৎসের ব্যয় বিভিন্ন। যেমন: ঋণ মূলধনের ব্যয় একটি, আবার শেয়ার মূলধনের ব্যয় আরেকটি। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন হবে যে,একটি কোম্পানি যখন কিছু ঋণ মূলধন ব্যবহার করে এবং একই সাথে কিছু শেয়ার মূলধন ব্যবহার করে তখন কোম্পানির মূলধনি ব্যয় কত? উত্তর হচ্ছে, সবগুলোর গড়। নিম্নের উদাহরণে বিষয়টি আলোচনা করা হলো:

উদাহরণ : একটি কোম্পানির সাধারণ শেয়ার মূলধন ২০০ কোটি টাকা, ঋণ মূলধন ২০০ কোটি টাকা ও অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ১০০ কোটি টাকা। ঋণকৃত মূলধনের সুদের হার ১০% ও অগ্রাধিকার শেয়ার লভ্যাংশের হার ৮% যার প্রতিটির লিখিত মূল্য ১০০ টাকা। সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজারমূল্য যথাক্রমে ২৫৫ টাকা ও ১১০ টাকা। কোম্পানি এ বছর সাধারণ শেয়ার মালিকদের প্রতি শেয়ারে ১৩ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে এবং অতীতে কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশ ৪% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর হার ৪০% হলে এই কোম্পানির গড় মূলধনি ব্যয় কত?

সমাধান

ঋণ মূলধনের ব্যয় (k_d)= সুদের হার (১-কর হার)×১০০ = ১০% (১-০.৪০)×১০০ = ০.১× .৬×১০০= ৬%

অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় (k_p) = (শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ ÷ শেয়ারের বাজার দর)×১০০=(১০০×৮% ÷১১০)×১০০=৭.২৭%

সাধারণ শেয়ারের ব্যয় (k_e)= $\left\{\frac{১৩(১+.০৪)}{২৫৫}+.০৪\right\}\times ১০০ = ৯.৩০\%$

এবার কোম্পানিটির সর্বমোট মূলধনে প্রতিটি উৎসের অংশ কত শতাংশ তা বের করতে হবে। বর্ণিত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে মোট মূলধনে সাধারণ শেয়ারের অংশ (২০০/৫০০) বা ৪০ শতাংশ, ঋণ মূলধন (২০০/৫০০) বা ৪০ শতাংশ এবং অগ্রাধিকার শেয়ারের অংশ (১০০/৫০০) বা ২০ শতাংশ। এই শতাংশ দিয়ে প্রতিটি উৎসের ব্যয়কে গুণ করে গুণফলের যোগফল করলে কোম্পানির মূলধনের গড় ব্যয় নির্ণয় হবে।

অর্থাৎ, গড় মূলধনি ব্যয় = (৯.৩× .৪)+(৬× .৪)+(৭.২৭× .২) = ৭.৫৭%

কাজ: একটি কোম্পানির মোট মূলধন ১০০০ কোটি টাকা যার মধ্যে সাধারণ শেয়ার মূলধন ৫০০ কোটি টাকা, ১২% অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ৩০০ কোটি টাকা এবং ১৫% ঋণপত্র ২০০ কোটি টাকা। ৫০ টাকা লিখিত মূল্যের প্রতিটি সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজারমূল্য যথাক্রমে ৪০ টাকা ও ৬০ টাকা। এ বছর সাধারণ শেয়ারে ১০% লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে এবং লভ্যাংশ বৃদ্ধির হার ৫%। কর হার ৩৫% হলে কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত আয়কে ব্যবসায়ের কী বলা হয়?

ক. মূলধন ব্যয়
খ. মুনাফার হার
গ. বিনিয়োগের সুদ
ঘ. তহবিলের উৎস

২. নিচের কোনটি দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের অন্যতম উৎস?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক
খ. অর্জিত লভ্যাংশ
গ. ব্যবসায়িক ঋণ
ঘ. সংরক্ষিত তহবিল

৩. ঋণ মূলধন ব্যয়ের পরোক্ষ সুবিধা কোনটি?

ক. মুনাফা বৃদ্ধি
খ. সুদ হ্রাস
গ. কর হ্রাস
ঘ. তহবিল বৃদ্ধি

৪. মূলধন মিশ্রণ নির্বাচনে গুরুত্ব দেওয়া হয়—

i. সর্বোচ্চ ঋণের সুবিধা
ii. কাম্য ঋণনীতি
iii. সর্বনিম্ন মূলধন ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫. নান্নু মিয়া ১২% সুদে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ফার্মেসি ব্যবসায় শুরু করেন। করের হার ১২% হলে তার কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন খরচ কত?

ক. ১০.৫৬ %
খ. ১২%
গ. ১৩.৪৪%
ঘ. ২৪%

৬. শবনম লি. প্রতিটি ৫০০০ টাকা মূল্যের ৯% অগ্রাধিকার শেয়ার ১০% কম মূল্যে বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। শবনম লি.এর মূলধন ব্যয় কত?

ক. ৯ %
খ. ১০%
গ. ১১.১১%
ঘ. ১৯%

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

জনাব টুটুলের ব্যবসায়ের মোট মূলধন ১ কোটি টাকা যার ৬০% নিজস্ব এবং অবশিষ্টাংশ ১৫% ঋণ। তিনি ২০% মুনাফায় বিনিয়োগ সুবিধা পেয়ে মূলধন কাঠামো পরিবর্তন করেন। ফলে ঋণ ও নিজস্ব তহবিলের বিপরীত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

৭. বর্তমানে টুটুলের ব্যবসায়ের ঋণমূলধন কত?

ক. ২০ লক্ষ টাকা খ. ৪০ লক্ষ টাকা

গ. ৬০ লক্ষ টাকা ঘ. ৭৫ লক্ষ টাকা

৮. মূলধন কাঠামো পরিবর্তনে জনাব টুটুল বিবেচনা করেছেন—

i. তহবিলের সুযোগ ব্যয়

ii. গড় মূলধন ব্যয়

iii. সর্বনিম্ন মূলধন ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মূলধন ব্যয় কী?

২. কাম্য ঋণনীতি বলতে কী বোঝায়?

৩. মূলধন মিশ্রণ বলতে কী বোঝায়?

৪. কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয়ের সূত্রটি লিখো।

৫. সংরক্ষিত আয়ের সুযোগ ব্যয় ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রিয়ন্তী টেক্সটাইল লি.-এর মোট মূলধন ১০ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ার মূলধন ৫ কোটি, ৬% অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ৩ কোটি এবং অবশিষ্ট ৮% ঋণমূলধন। এ বছর কোম্পানি শেয়ারপ্রতি ২ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করে এবং তা প্রতিবছর ১০% বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজারমূল্য যথাক্রমে ২০ টাকা ও ২৫ টাকা। কর হার ৩০%। বর্তমানে কোম্পানির গড় মূলধন ব্যয় ১০% এর বেশি হওয়ায় পরিচালনা পর্ষদ শূন্য লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতির সুপারিশ করেন।

ক. ঋণ মূলধনের ক্ষেত্রে সুদের হারকে ব্যবসায়ে কী বলা হয়?

খ. 'বিনিয়োগ যত ঝুঁকিপূর্ণ প্রত্যাশিত আয় তত বেশি' – ব্যাখ্যা করো।

গ. বর্তমানে প্রিয়ন্তী টেক্সটাইলের সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় নির্ণয় করো।

ঘ. পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ অনুসরণে প্রিয়ন্তী টেক্সটাইল লি.-এর গড় মূলধন ব্যয় কাম্য স্তরে রাখতে পারবে কি না, তা মূল্যায়ন করো।

অষ্টম অধ্যায়

মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং

Currency, Bank & Banking

মুদ্রার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। পৃথিবীতে মুদ্রা প্রচলনের ফলে অর্থনীতির নানা সমস্যার সমাধান হয়েছে। মুদ্রার বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাংক ব্যবস্থার। ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশসহ বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। এ অধ্যায়ে মুদ্রা, ব্যাংক, ব্যাংকিং ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- মুদ্রা এবং তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকারের মধ্যে যোগসূত্র নির্ণয় করতে পারব।
- ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারব।

৮.১. মুদ্রা ও তার ইতিহাস

মানব সৃষ্টি ও সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজন, কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক বন্ধনের পরিধি প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রথমে মানুষের চাহিদা ছিল খুব সীমিত এবং পরস্পরের মধ্যে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের চাহিদা নির্বাহ করতো। 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' এই প্রথাটি বিনিময় প্রথা (Barter System) হিসেবে পরিচিত।

পর্যায়ক্রমে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিধি বাড়ার সাথে সাথে মানুষের কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে বিনিময় কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে এবং সাথে সাথে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যার পিছনে ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা এবং পরবর্তীতে জাহাজের অবদান অসামান্য। যোগাযোগের অসুবিধা দূর হওয়ার সাথে সাথে ভৌগোলিক বিভিন্ন অবস্থান থেকে প্রয়োজনমতো দ্রব্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গ্রাম থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহর এবং দেশ থেকে দেশে দ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি বিনিময় মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভূত হতে থাকে। বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও সঞ্চয়ের ভান্ডার এবং মূল্যের পরিমাপক হিসেবে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা মুদ্রা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র। ইতিহাস থেকে দেখা যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকার এবং প্রকৃতির মুদ্রা বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হতো। বিনিময় মাধ্যমে মুদ্রা হিসেবে বিভিন্ন সময় কড়ি, হাঙ্গরের দাঁত, হাতির দাঁত, পাথর, ঝিনুক, পোড়া মাটি, তামা, রূপা ও সোনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

ছবি : তামা, ঝিনুক, হাতির দাঁতের আদিম যুগের মুদ্রার ছবি

ব্যবহার, স্থানান্তর, বহন এবং অন্যান্য অসুবিধার কারণে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধাতব মুদ্রা ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ধাতব পদার্থের সরবরাহ ঘাটতি দেখা দেয়, তাছাড়া স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অলংকারাদিসহ অন্যান্য ব্যবহারের কারণে কাগজি মুদ্রার প্রচলন ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়। বর্তমানে কাগজি মুদ্রার সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার প্রচলন থাকলেও ধাতব মুদ্রার ব্যবহার এখন ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। কাগজের সহজলভ্যতা, সহজে বহনযোগ্য হওয়া এবং বর্তমানে বিভিন্ন রকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

কাজ : বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা ও কাগজি মুদ্রার তালিকা প্রস্তুত করো।

৮.২ মুদ্রা

কার্যকারিতার ভিত্তিতে মুদ্রা বলতে আমরা বুঝি, 'মুদ্রা একটি বিনিময় মাধ্যম, যা সবার নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে'। এই সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি, মুদ্রা নিম্নলিখিত কর্ম সম্পাদন করে :

- বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ যেকোনো লেনদেন করার জন্য মুদ্রা ব্যবহার করা যায়। যেমন: একটি বই কিনতে তুমি টাকা ব্যবহার কর। এখানে টাকা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মুদ্রার এটা সবচেয়ে প্রধান কাজ।
- সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ তুমি যখন ভবিষ্যতের জন্য কোনো সঞ্চয় করতে চাও, তখন টাকার মাধ্যমে এই সঞ্চয় করতে পারো। টাকার অস্তিত্ব না থাকলে তোমার সঞ্চয়ের কাজটি খুবই দুরুহ হয়ে যেত।
- মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ যেকোনো অর্থনৈতিক পণ্য বা সেবার মূল্য কত এটা নির্ধারণ করা টাকার একটি কাজ। টাকার অস্তিত্ব আছে বলেই আমরা খুব সহজে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১০০ টাকা নির্ধারণ করতে পারি, একটা বইয়ের মূল্য ২০০ টাকা নির্ধারণ করতে পারি, এক কেজি চালের মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করতে পারি। এতে করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সহজসাধ্য হয়ে যায়।
- মূল্যের মান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও মুদ্রার ব্যবহার হয়ে থাকে।

৮.৩ মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়, যার ফলে মানুষের মধ্যে লেনদেন এবং বিনিময়ের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার জন্য মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়। ব্যাংক ব্যবস্থা বিবর্তনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাংক মুদ্রাকেই তার ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

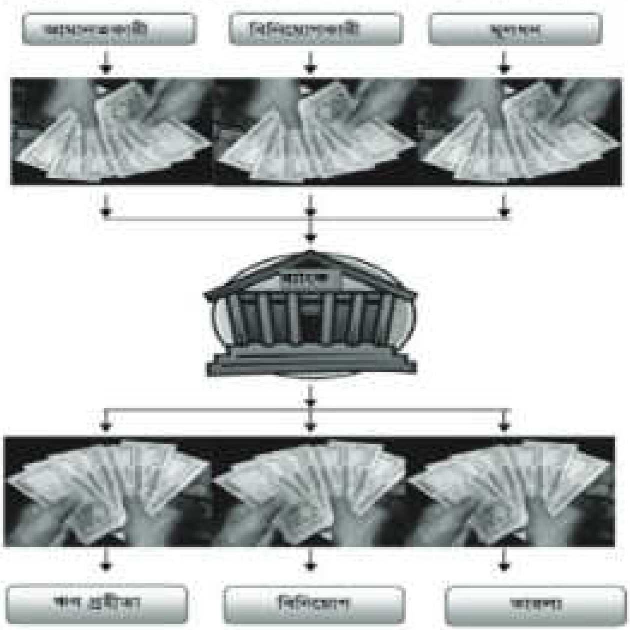

চিত্র ৮.১ : চিত্রে বিনিয়োগকারী ও আমানতকারী থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংক কীভাবে বিনিয়োগ করে তা দেখানো হয়েছে

মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ তার সঞ্চয় হিসাবে সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংক তার আমানতের সৃষ্টি করে, যার বিনিময়ের সঞ্চয়কারী একটি নির্দিষ্ট সুদ বা মুনাফা পেয়ে থাকে। এই আমানত ঋণগ্রহীতাকে ঋণ হিসাবে বর্ধিত সুদে প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক তার ব্যবসায়িক মুনাফা লাভ করে থাকে। মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহারও সীমিত।

৮.৪ ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার

ব্যাংক

ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কঠিন। ব্যাংক শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুবিশেষের স্তূপ, কোষাগার, লম্বা টেবিল হিসেবেও এই শব্দের বিস্তৃতি আছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে, প্রাচীন ল্যাটিন শব্দ Banco, Bangk, Banque, Bancus প্রভৃতি শব্দ থেকেই Bank শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এই মতে অনুসারীদের যুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক শব্দের ল্যাটিন অর্থ বেঞ্চ অথবা বসবার জন্য ব্যবহৃত লম্বা টেবিল, যার সম্পর্কে ইতিহাসের পাতায় সমর্থন পাওয়া যায়।

মধ্যযুগীয় অর্থনীতির ইতিহাসে দেখা যায় ইতালির Lombardy Street-এ একশ্রেণির লোক একটি লম্বা টুল বা বেঞ্চে অর্থ জমা রাখা এবং অর্থ ধার দেওয়ার ব্যবসা পরিচালনা করত, যা ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকায়ও একইভাবে পরিচালিত হতো। তাই ব্যাংক শব্দটির ল্যাটিন উৎপত্তির পেছনে বেশি সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা বলতে পারি, এটি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে আমানত সংগ্রহ করে এবং মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে বিনিয়োগ করে এবং চাহিবামাত্র অথবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে সঞ্চয়কারীর কাছে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।'

কাজ : শ্রেণিকক্ষে ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারের আদলে একটি সেট তৈরি করো। তোমাদের মধ্য থেকে কয়েকজন গ্রাহক, কয়েকজন ব্যাংকারের ভূমিকা প্রদর্শন করো।

ব্যাংকিং

অক্সফোর্ড ডিকশনারির মতে, 'ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।' ব্যাংকিং শব্দটি ব্যাংকের কার্যাবলির একটি বিস্তৃত ধারণা অর্থাৎ ব্যাংকের সকল আইনসংগত কার্যাবলি ব্যাংকিং হিসেবে পরিচিত। ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি যা ব্যাংকিং হিসেবে পরিচিত তা নিম্নরূপ:

- **জনগণ থেকে অর্থ/আমানত সংগ্রহ :** যাদের আয় ব্যয় থেকে বেশি, তারা দেশের সঞ্চয়কারী। ব্যাংক তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন মেয়াদি আমানত সংগ্রহ করে।
- **ঋণ দান :** কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তহবিলের তুলনায় মালিকদের/উদ্যোক্তাদের সরবরাহকৃত তহবিলের পরিমাণ কম হলে ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাংক ঋণ দিয়ে এদের সাময়িক ঘাটতি পূরণ করে থাকে।
- **বাট্টাকরণ ও বিনিময় বিলে স্বীকৃতি :** ব্যাংকের আরেকটি কাজ হলো প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ এবং দেয় বিলে স্বীকৃতি প্রদান।
- **বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও প্রত্যয়ন :** আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের দেশি মুদ্রা থেকে

বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রা থেকে দেশি মুদ্রায় রূপান্তর করা প্রয়োজন, যা ব্যাংকগুলোর অন্যতম কাজ। আবার প্রত্যয়ন পত্র বা Letter of Credit (LC)-এর মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারককে আমদানিকারকের পক্ষ থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে। আমদানিকারকের পক্ষে এ সংক্রান্ত বিনিময় বিলে প্রত্যয়ন করাও ব্যাংকের একটি কাজ।

- **অর্থ স্থানান্তর :** একটি শহর থেকে আরেকটি শহরে বিশেষত দুটি ভিন্ন দেশে ভিন্ন মুদ্রা থাকার কারণে অর্থ স্থানান্তর বেশ কঠিন। ব্যাংক এই কাজটি সহজে সামান্য খরচে করে থাকে।
- **মূল্যবান দলিল/বস্তু নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণের ব্যবস্থা :** মূল্যবান সামগ্রী যেমনঃ সোনার গহনা নিজের কাছে রাখা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ চুরি-ডাকাতি হতে পারে। একইভাবে মূল্যবান দলিল-সার্টিফিকেট নিজের কাছে রাখলে নানাভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এসব মূল্যবান সামগ্রী ও দলিলাদি ব্যাংক নিরাপদে সংরক্ষণ করে।
- **সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অর্থবিষয়ক উপদেশ দেওয়া :** মক্কেলদের অনুরোধে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক পরামর্শ দেওয়া এবং তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যেমন: বাড়িভাড়া আদায় করাও ব্যাংকের কাজ।

ব্যাংকার

ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে ব্যাংকার বলা হয়। ব্যাংক এবং ব্যাংকার শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যাংক এবং ব্যাংকিং কার্যাবলি ব্যাংকের নিজের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভবপর না হওয়ায় ব্যাংকিং বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালিত হয়।

৮.৫ ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে মানুষ তার অতিরিক্ত আহরিত এবং উৎপাদিত পণ্য অন্যের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের প্রয়োজন নির্বাহ করত, দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যের এই বিনিময় প্রথা বহুদিন প্রচলিত ছিল, বর্তমান ব্যবস্থায় **বিনিময় প্রথা** (Barter System) স্বল্প পরিসরে প্রচলিত আছে। মুদ্রা আবিষ্কারের পর পর ব্যবসায় বাণিজ্য, লেনদেন এবং মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকে ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি বলে জানা যায়। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে প্রথম ব্যাংক ব্যবস্থা ইতিহাসে স্থান করে নেয়। পরবর্তীকালে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা ব্যাংকিং ব্যবসায়কে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে খ্রিষ্টপূর্ব চার শ সাল পর্যন্ত অবদান রাখে। ভারত অঞ্চলে প্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসাবে দি হিন্দুস্তান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০০ সালে। পরে ১৯৩৫ সালে ভারতের সকল ব্যাংকের প্রধান হিসেবে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান আমলে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান ব্যাংকিং ব্যবসায় প্রসারে এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্ব দান করে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের উৎপত্তির সাথে সাথে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রপতির আদেশে প্রতিষ্ঠিত (যা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ হতে কার্যকর) হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ১২টি ব্যাংকের ১০৯০টি শাখা কর্মরত ছিল। কিন্তু ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন এবং ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের মালিক ছাড়া অন্যান্য ব্যাংকের মালিকগণ অবাঙালি হওয়ায় এবং তাদের প্রধান অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবসায় মুক্তিযুদ্ধের পর পর প্রচণ্ড সংকটে নিপতিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন শুরু করেন এবং সব ব্যাংকের জাতীয়করণ করেন, যার কারণে নিম্নলিখিত ৬টি নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক জন্ম লাভ করে। এগুলো হলো : সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংক। পরে এদের মধ্যে শুধু সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক ছাড়া সবগুলোই ক্রমশ বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। সত্তরের দশকেই অনুধাবন করা যায় যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারছে না। আশির দশকে শুরু হয় বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া। আশির দশকের পরেই নব্বই দশক পরবর্তীতে বেসরকারি খাতে আরও কিছু নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি, বিশেষায়িত এবং বেসরকারি ব্যাংক কার্যকর আছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানবসভ্যতার বিবর্তনে কেন দ্রব্যাদি একে অপরের সাথে বিনিময়ের প্রয়োজন হয়?

ক. চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে খ. সামাজিক বন্ধন বাড়াতে

গ. দ্রব্যসমূহ স্থানান্তরের নিমিত্তে ঘ. যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য

২. কাগজি মুদ্রা প্রচলনের কারণ-

i. ধাতুর বিকল্প ব্যবহার

ii. ধাতব মুদ্রার দীর্ঘস্থায়িত্ব

iii. ধাতব পদার্থের দুষ্প্রাপ্যতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

গল্পচ্ছলে সীমা একদিন তার দাদির কাছ থেকে জানতে পারল যে আগেকার যুগে মানুষেরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য একেকজনের সাথে বিনিময় করত, কিন্তু তাতে করে সব ধরনের পণ্য বিনিময় করা যেত না।

৩. তখনকার দিনে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য মূলত-

i. সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতো

ii. চাহিদা পূরণ করতে ব্যবহৃত হতো

iii. অতিরিক্ত হওয়ায় বিনিময় করা হতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. কীসের মাধ্যমে পণ্য বিনিময়ের অসুবিধা দূর হয়?

ক. জাহাজ আবিষ্কারের ফলে খ. ধাতব মুদ্রার প্রচলনের মাধ্যমে

গ. ভৌগোলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি হওয়ায় ঘ. মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কোথা থেকে ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়?

২. Letter of Credit (LC) কী?

৩. অর্থ স্থানান্তর কাজটি কার জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

সৃজনশীল প্রশ্ন

আজমি নুর নবম শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একজন শিক্ষার্থী। তার বাবা একজন উচ্চপদস্থ ব্যাংক কর্মকর্তা। সে তার বাবাকে সবসময় ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে।

ক. দ্রব্য বিনিময় প্রথা কী?

খ. মুদ্রা ও ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করো।

গ. ব্যাংকিং ও আজমি নুরের বাবার পেশাটি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ব্যাংক ব্যবসার ক্রমবিকাশে আজমি নুরের বাবার মতো কর্মকর্তাগণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

নবম অধ্যায়

ব্যাংকিং ব্যবসায় ও তার ধরন

Banking Business and Types

ব্যবসায়ের মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবসায় অন্যতম। বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। ব্যাংকের গঠন, কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য, মূলনীতি, ব্যবস্থাপনাসহ নানাদিকে ভিন্নতা রয়েছে। সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাংক গঠিত হতে পারে। ব্যাংকিং ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চিত্র: ব্যাংক লেনদেনের চিত্র

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ব্যাংকের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যাংক ব্যবসায়ের মূলনীতিসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব।

৯.০ সূচনা

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবসায়ের আকার, আকৃতি, উদ্দেশ্য ও গঠনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যুগের সাথে সাথে সনাতন, ব্যাংকিং ব্যবসায় আধুনিকতার ছোঁয়া এনে দিয়েছে। তাছাড়া ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নতুন নতুন ব্যাংকিং পণ্যের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবাকে যুগোপযোগী এবং ক্রেতার প্রয়োজন অনুসারে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

৯.১ ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি

ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোত্রের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। আমরা এখানে ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটি গোত্রের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য আলোচনা করব।

ক. ব্যাংকের মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি
খ. সরকার এবং রাষ্ট্রীয় পক্ষের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি
গ. ব্যাংক গ্রাহকদের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি

ক. ব্যাংকের মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি

১. **তহবিলের বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জন :** ব্যাংকের মালিক, অংশীদার ও শেয়ার হোল্ডারদের সঞ্চিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগ করা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জনের জন্য প্রয়োজন কাঙ্ক্ষিত হারে মুনাফা অর্জন। প্রতিটি বিনিয়োগের একটি সুযোগ ব্যয় আছে, অন্তত সেই হারে মুনাফা অর্জন না করতে পারলে এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

২. **সুনাম অর্জন :** সুনাম প্রতিষ্ঠানের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করে যথাযথ ব্যাংকিং করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করতে পারলে তাতে করে মালিকপক্ষের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

৩. **উন্নয়নে অংশগ্রহণ :** ব্যাংক বিভিন্ন খাতে অর্থ বিনিয়োগ করে দেশে উৎপাদন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। বিশেষ করে শিল্পায়ন, শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংক জাতীয় উন্নয়নে মালিকপক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এতে মালিকপক্ষের বিনিয়োগ সার্থক হয়।

৪. **সামাজিক অবদান :** বিভিন্ন রকম সামাজিক কার্মকাণ্ডের মাধ্যমে এবং অর্জিত মুনাফার একটি অংশ সামাজিক উন্নয়নে ও সমাজ গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা তাদের একটি উদ্দেশ্য।

খ. সরকার এবং রাষ্ট্রীয় পক্ষের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি

১. **নোট ও মুদ্রার প্রচলন :** নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে একমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা প্রচলন করে। ব্যাংক চেক কখনো বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে এবং মুদ্রার বিকল্প হিসেবে কাজ করে সরকারের মুদ্রা প্রচলনের কাজটি সহজ করে দেয়।

২. **মূলধন গঠন :** সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগের জন্য ঋণ দেয়। দেশে মূলধন গঠনে সাহায্য করা এবং সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা ব্যাংকের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

৩. **বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন :** ব্যাংক যেকোনো খাতে ঋণ দেবার আগে ওই খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে। সরকার নিয়মিতভাবে তার অগ্রাধিকারের খাতগুলো দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে। ব্যাংক সেই অগ্রাধিকারযুক্ত খাতে অর্থায়ন করে সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে।

৪. **মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ :** সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের দ্রব্যমূল্য বা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সর্বদা মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এই কাজটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিচ্ছিন্নভাবে একা একা সাফল্যের সাথে সম্পাদন করতে পারে না। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক এক্ষেত্রে মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সাহায্য করে।

৫. **কর্মসংস্থান :** দেশের বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য সরকারকে সাহায্য করা ব্যাংক ব্যবস্থার একটি কাজ। ব্যাংকগুলো সেসব প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করতে পারে, যেগুলো অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। যেমন: মূলধননির্ভর প্রযুক্তির বদলে শ্রমনির্ভর প্রযুক্তিতে অর্থায়ন করে ব্যাংক অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সরকারকে সাহায্য করে।

গ. ব্যাংক গ্রাহকদের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি

১. **আমানত :** গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের আমানত সৃষ্টি করে। চলতি আমানতে সুদ নেই, কিন্তু অনেক ধরনের সেবা পাওয়া যায়। সঞ্চয়ী আমানতে প্রায় ৫% থেকে ৭% হারে সুদ পাওয়া যায় আবার যখন প্রয়োজন টাকা তুলে ফেলা যায়। মেয়াদি আমানতের সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশি তবে সাধারণত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে টাকা তোলা তেমন লাভজনক হয় না। মেয়াদি আমানত নিম্নে ১ মাস এবং উর্ধ্বে যেকোনো সময়ব্যাপী হতে পারে। আমানতকারীকে তার সুবিধামতো আমানত সৃষ্টিতে সাহায্য করা ব্যাংকের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য।

২. **নিরাপত্তা :** গ্রাহকের অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপত্তা প্রদান করা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজে নিজের কাছে বা বাসায় অনেক অর্থ, সোনা-গহনা বা অন্যান্য মূলবান সামগ্রী রাখা নিরাপদ নয়। এসব সামগ্রী নিরাপদে গচ্ছিত রাখা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

৩. **উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা :** ব্যাংক যখন কোনো প্রকল্পে অর্থ লগ্নি করে, তখন প্রকল্পের লাভজনকতা মূল্যায়ন করে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই অর্থায়নে জড়িত হয়। প্রকল্পটির লাভজনকতা ঋণের আবেদনকারীর জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাংকের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকের পেশাগত দক্ষতা প্রকল্পের লাভজনকতার ব্যাপারে আবেদনকারীর ধারণাকে শক্তিশালী করে। প্রকল্পটি যদি পরিবর্ধন পরিমার্জন করতে হয়, ব্যাংক সে পরামর্শ প্রদান করে। আরও বিভিন্ন রকম আর্থিক এবং অর্থসংক্রান্ত পরামর্শ ব্যাংক গ্রাহককে দিয়ে থাকে।

৪. **প্রতিনিধি ও অছি :** সেবার মূল্য গ্রহণের বিনিময়ে মক্কেলের পক্ষে প্রতিনিধি/অছি হিসাবে কাজ করা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য। ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে ব্যবসায়িক চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে, বিনিময় বিলে সই করে, বাসা ভাড়া সংগ্রহ করে।

৫. **অর্থ স্থানান্তর :** ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের নির্দেশ মোতাবেক অর্থ দেশ ও বিদেশে স্থানান্তর করে থাকে। বর্তমান ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সাহায্যে ব্যাংক গ্রাহকদের অর্থ স্থানান্তরের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি নিরাপদে সম্পন্ন করে।

৬. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সহজীকরণ :** গ্রাহকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকল্পে ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন সেবা ও পণ্য সৃষ্টি করে। ক্রেডিট কার্ড দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রাহক নগদ টাকা ছাড়াই পণ্য ক্রয় করতে পারে। এটিএম মেশিন থেকে নগদ টাকা তোলা যায়।

বর্তমানে দেশের সব বড় শহরের বিভিন্ন এলাকায় ২৪ ঘণ্টা বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং সেবা ব্যবস্থা চালু আছে। তাছাড়া মোবাইল ব্যাংকিং ও ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা সহজ করা হয়েছে।

৯.২ ব্যাংকের গঠন

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন অনুযায়ী বর্তমানে সর্বনিম্ন ২ জন ও সর্বোচ্চ ১৩ জন পরিচালকের সমন্বয়ে প্রাইভেট ব্যাংক স্থাপন করা যায়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিকানায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সীমাহীন পরিচালকের সমন্বয়ে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায়। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনহীন ব্যাংকগুলো সমবায় বা অন্য যেকোনো নামে পরিচালিত হলেও তা বেআইনি ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

৯.৩. ব্যাংকিং ব্যবসার মূলনীতি

ব্যাংকিং একটি ঝুঁকিবহুল ব্যবসায়। ঝুঁকি মোকাবেলার শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা না গড়লে ঝুঁকি এড়ানো কঠিন। অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করার কারণে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বেশকিছু মৌলিক নীতি মেনে চলতে হয় যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. **নিরাপত্তার নীতি :** ব্যাংক ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো গ্রাহকের অর্থের নিরাপত্তা বিধান। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংককে ঋণপ্রদানের সময় ঋণগ্রহীতার আর্থিক সাচ্ছলতা ও সততা বিচার করা এবং পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ করা উচিত।

২. **মুনাফার নীতি :** সুষ্ঠু মুনাফা অর্জন করা ব্যাংকের আরেকটি অপরিহার্য নীতি। ঋণগ্রহীতার নিকট হতে প্রাপ্ত সুদ ও আমানতকারীগণকে প্রদত্ত সুদের পার্থক্যই ব্যাংকের মুনাফার প্রধান অংশ।

৩. **তারল্যনীতি :** আমানতকারী যখন টাকা তুলতে চায়, তখন তাদের নগদ টাকা দিতে হবে। আবার এটা বিবেচনায় রেখে যদি আমানতের সব টাকা ব্যাংক তরল অবস্থায় রেখে দেয়, তবে ব্যাংকের কোনো বিনিয়োগ হবে না এবং ব্যাংকটির কোনো মুনাফাও হবে না। সুতরাং সার্থক ব্যাংক ব্যবসায় মানে হলো সঠিক তারল্যনীতি যেখানে অতিরিক্ত তারল্যও থাকবে না আবার তারল্য সংকটও হবে না। তারল্যনীতি ব্যাংক ব্যবসায়ের অন্যতম মূলনীতি।

৪. **সাচ্ছলতার নীতি :** ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক সাচ্ছলতা প্রয়োজন। আর্থিক সাচ্ছলতার অভাবে ব্যাংক দেউলিয়া হতে পারে। তাই আর্থিক সাচ্ছলতা ব্যাংকের একটি অন্যতম নীতি।

৫. **দক্ষতার নীতি :** ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা বোর্ড, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতার উপর ব্যাংকের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে সাফল্য অর্জনের জন্য তাই দক্ষতা অর্জন ও তা মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

৬. **সেবার নীতি :** ব্যাংকের গ্রাহকদের বহুবিধ সেবা প্রদান করা ব্যাংকের একটি অন্যতম দায়িত্ব। গ্রাহকদের পর্যাপ্ত বহুমুখী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকের উন্নতি সম্ভব।

৭. **প্রচারনীতি :** উপযুক্ত, বোধগম্য ও আকর্ষণীয় প্রচারের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রসার সম্ভব। ব্যাংক তার কর্মদক্ষতা, বিশ্বস্ততা ও সেবামূলক কার্যাদি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুলে ধরে গ্রাহকদের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতে পারে।

৮. **গোপনীয়তার নীতি :** ব্যাংকের মক্কেলের আস্থা অর্জনের একটি উপায় তাদের হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করা। তাই গোপনীয়তা রক্ষা করা ব্যাংকের একটি অন্যতম নীতি।

৯. **সুনামের নীতি :** উন্নত ব্যবস্থাপনা, দক্ষ পরিচালনা, গোপনীয়তা রক্ষা এবং সেবামূলক কাজের মাধ্যমে বাজারে সুনাম সৃষ্টি করা ব্যাংকের অন্যতম মূলনীতি।

১০. **বিনিয়োগ নীতি :** বিনিয়োগের শর্তসমূহে (বিনিয়োগের আকার, মেয়াদ, সুদের হার ইত্যাদি) যে নীতি অনুসরণ করা হয়, তাই বিনিয়োগের নীতি। সুষ্ঠু বিনিয়োগ নীতির উপর ব্যাংকের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

১১. **উন্নয়নের নীতি :** মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য-সহযোগিতা করাও ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

১২. **ঋণমঞ্জুর নীতি :** ঋণ প্রদানের পূর্বে ব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্পের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা বিবেচনা করে। এ ব্যাপারে অনুৎপাদনশীল এবং অনিশ্চিত ক্ষেত্রে ঋণ প্রত্যাখ্যান করা ব্যাংকের একটি উল্লেখযোগ্য নীতি।

১৩. **মিতব্যয়িতার নীতি :** 'স্বল্পব্যয়ে অধিক মুনাফা' ব্যাংকের অন্যতম নীতি। ব্যয় সংকোচন নীতির মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব।

১৪. **সততা ও বিশ্বস্ততার নীতি :** দক্ষ ব্যাংক ব্যবসায়ের পূর্বশর্ত হলো ব্যাংকের উপর গ্রাহকদের আস্থা। এই আস্থা অর্জনের জন্য ব্যাংক সর্বক্ষেত্রে সততা ও বিশ্বস্ততার নীতি অবলম্বন করে থাকে। এই আস্থার বলেই গ্রাহক তাদের অর্থ ও মূল্যবান সম্পদ ব্যাংকের কাছে জমা রাখে।

১৫. **সাবধানতার নীতি :** অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাবধানতার নীতি মেনে চলা বাঞ্ছনীয়।

১৬. **বিশেষায়ণের নীতি :** বৈদেশিক বাণিজ্য, ঋণ দান, নোট ইস্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাংক বিশেষায়ণের নীতি অনুসরণ করে থাকে। ফলে কার্যের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৯.৪ ব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস

কার্যাবলি, মালিকানা, অঞ্চল, গ্রাহক ইত্যাদির ভিত্তিতে ব্যাংকিং ব্যবসায়কে নিম্নলিখিত ৯.২ নং ছক অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করা যায়:

ক. কার্যভিত্তিক শ্রেণিকরণ ১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২. বাণিজ্যিক ব্যাংক ৩. কৃষি ব্যাংক ৪. শিল্প ব্যাংক ৫. বিনিময় ব্যাংক ৬. অন্যান্য ব্যাংক **খ. মালিকানাভিত্তিক শ্রেণিকরণ** ১. রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ২. যৌথ মালিকানা ব্যাংক ৩. সমবায় ব্যাংক ৪. এনজিও ব্যাংক ৫. বিদেশি ব্যাংক	**গ. অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণিকরণ** ১. আঞ্চলিক ব্যাংক ২. জাতীয় ব্যাংক ৩. আন্তর্জাতিক ব্যাংক **ঘ. বিশেষ গ্রাহকভিত্তিক শ্রেণিকরণ** ১. শ্রমিক ব্যাংক ২. মহিলা ব্যাংক ৩. স্কুল ব্যাংক ৪. ভোক্তাদের ব্যাংক **ঙ. সুদমুক্ত ব্যাংক**

ছক নং ৯.২: ব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস

ক. কার্যভিত্তিক শ্রেণিকরণ

১. **কেন্দ্রীয় ব্যাংক :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সব ব্যাংকের মুরব্বি, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) মুদ্রাবাজারকে সুসংগঠিত আকারে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই গঠিত। সাধারণত মুদ্রা প্রচলন, অর্থ সরবরাহ এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়োজিত। পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে। বাংলাদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক, ইংল্যান্ডে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, জাপানে ব্যাংক অব জাপান কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কার্যরত রয়েছে।

২. **বাণিজ্যিক ব্যাংক :** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ এবং সে আমানত হতে ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবায় নিয়োজিত ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank) বলা হয়। যেমন: ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড।

৩. **কৃষি ব্যাংক :** কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকগণকে বিভিন্ন মেয়াদের ঋণ প্রদানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে যে ব্যাংক কাজ করে তাকে কৃষি ব্যাংক বলে। এটি একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। আমাদের কৃষি উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে কৃষি ব্যাংকের দক্ষতার উপর। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **শিল্প ব্যাংক :** দেশের শিল্প খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে শিল্প ব্যাংক বলে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ভূমি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য শিল্প ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। বিডিবিএল (Bangladesh Development Bank Limited) বাংলাদেশে এই ধরনের একটি ব্যাংক।

৫. **বিনিময় ব্যাংক :** বৈদেশিক লেনদেন নিষ্পত্তি ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিনিময় ব্যাংক বলে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, রপ্তানি ইত্যাদি এ ব্যাংকের কাজ।

৬. **অন্যান্য ব্যাংক :** কার্যভিত্তিক শ্রেণিকরণে উল্লিখিত ব্যাংকগুলো ছাড়াও রয়েছে বিনিয়োগ ব্যাংক, সঞ্চয়ী ব্যাংক, বন্ধকী ব্যাংক, পরিবহন ব্যাংক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক, আমদানি-রপ্তানি ব্যাংক প্রভৃতি। বিনিয়োগ ব্যাংক নবগঠিত কোম্পানির শেয়ারের অবলেখন বা underwriting, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান, ব্রিজ ফিন্যান্স, ডিবেঞ্চার ফিন্যান্সসহ বিভিন্ন পরামর্শমূলক কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। সঞ্চয়ী ব্যাংক জনগণের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় হিসাবে গ্রহণ ও মুনাফা বা সুদ প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে অধিক সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে তোলে। যেকোনো সময় এ ধরনের ব্যাংকে টাকা জমা এবং অর্থ উত্তোলনের সুযোগ বা অন্যান্য নিয়মে এই ব্যাংকের সঞ্চয় পরিচালিত হয়। ভূমি বন্ধক রেখে কৃষি বা শিল্পের প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদে যে ব্যাংক ঋণ প্রদান করে, তাকে বন্ধকি ব্যাংক বলে। পরিবহন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে পরিবহন ব্যাংক বলা হয়। এ ব্যাংক যানবাহন নির্মাণ, যন্ত্রাংশ আমদানি, আধুনিকীকরণ, খুচরা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ সরবরাহ করে থাকে। ক্ষুদ্রশিল্পের উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান

করে থাকে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে আমদানি-রপ্তানি ব্যাংক বলা হয়। এই ব্যাংক মূলত আমদানির জন্য ঋণ সরবরাহ, প্রত্যয়পত্র (L/C) সুবিধা, আমদানি তদারকিসহ বিভিন্ন উপদেশমূলক কাজ করে থাকে।

কাজ: তোমার এলাকার বিভিন্ন কর্মজীবীদের পেশা, কাজের ধরন বিবেচনা করে কে কোন ধরনের ব্যাংকের সহযোগিতা গ্রহণ করবে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

খ. মালিকানাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

১. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক : সম্পূর্ণভাবে সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি ব্যাংক বলা হয়। যেমন: সোনালী ব্যাংক লি., জনতা ব্যাংক লি., বেসিক ব্যাংক লি. ইত্যাদি।

২. যৌথমূলধনি কোম্পানি ব্যাংক : কোম্পানি আইনের আওতায় যে ব্যাংক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে যৌথমূলধনি কোম্পানি ব্যাংক (Joint Stock Company Bank) বলা হয়। এই ধরনের ব্যাংকগুলো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির আদলে গঠিত হয়।

৩. সমবায় ব্যাংক : সমবায়ের নীতি ও আইন অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে সমবায় ব্যাংক বলা হয়।

৪. এনজিও ব্যাংক : বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো তাদের কাজের পাশাপাশি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক গঠন করে। এনজিওদের পরিচালিত ব্যাংকগুলো এ ধরনের ব্যাংকের আওতাভুক্ত।

৫. বিদেশি ব্যাংক : এক দেশের ব্যাংক যখন অন্য দেশে এসে ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে, ঐ দেশের জন্য তারা বিদেশি ব্যাংক হিসাবে আখ্যায়িত হয়। অর্থাৎ, বিদেশি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাংককে বিদেশি ব্যাংক বলে। যেমন : স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।

গ. অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণিকরণ

১ আঞ্চলিক ব্যাংক : কোনো অঞ্চল বিশেষের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে আঞ্চলিক ব্যাংক (Regional Bank) বলা হয়। যেমন: রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।

২. জাতীয় ব্যাংক : একটি দেশের সীমানায় থেকে ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা করলে তাকে জাতীয় ব্যাংক (National Bank) বলে।

৩. আন্তর্জাতিক ব্যাংক : একটি দেশের জাতীয় সীমানার গণ্ডি ভেদ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে যে ব্যাংকের শাখা পরিচালনা করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank) বলে।

ঘ. বিশেষ গ্রাহকভিত্তিক শ্রেণিকরণ

১. শ্রমিক ব্যাংক : শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করে জীবনধারণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমাদের দেশে স্বতন্ত্রভাবে শ্রমিক ব্যাংক নেই, তবে শিল্প-কারখানা এলাকায় শাখা খুলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ উদ্দেশ্য সাধন করে।

২. নারীদের ব্যাংক : নারীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার জন্য, তাঁদেরকে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে পরিচিত করার জন্য এবং সর্বোপরি নারীদের বিভিন্ন ব্যাংকিং-সুবিধা প্রদান করার জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যাংককে নারীদের ব্যাংক বলে।

৩. স্কুল ব্যাংক : উন্নত দেশগুলোতে স্কুল ব্যাংক ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আমাদের দেশে অবশ্য এ ধরনের ব্যাংক ১৯৬০ সালের দিকে একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের জন্য সঞ্চয় বাক্স বা ব্যাগ সরবরাহ করা হয়। শিক্ষার্থীরা এতে টাকা-পয়সা জমা করে থাকে। স্কুল থেকেই সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

৪. ভোক্তাদের ব্যাংক : ভোক্তাদের বাকিতে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা প্রদানের জন্যই এ ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয়। ব্যাংক তার মক্কেলকে একটি কার্ড সরবরাহ করে, যার নাম Credit Card এবং এর দ্বারা ভোক্তা বাকিতে বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারে।

ঙ. সুদমুক্ত ব্যাংক

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী সুদমুক্তভাবে ব্যাংকিং সেবাদানের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সেবা প্রদানের সামঞ্জস্য থাকলেও ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের নিম্নলিখিত পণ্য ও সেবা দেখতে পাওয়া যায়।

১. মুদারাবা : গ্রাহককে ব্যবসায়ের মূলধন জোগান দেওয়া এবং ব্যবসায়ের শরিক হিসেবে তার মূলধন ব্যবস্থাপনা করা এই সেবার অংশ।

২. মুসারাকা : ব্যাংক এবং গ্রাহকের যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে লাভ ও লোকসান সমবণ্টনের মাধ্যমে এই ধরনের ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়।

৩) মুরাবাহা : ঋণগ্রহীতাকে কোনো কিছু (গাড়ি, যন্ত্রপাতি) ক্রয়ের জন্য যখন অর্থায়ন করা হয়, তখন তাকে মুরাবাহা সেবা বলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক কিছু লাভসহ ঋণের অর্থ ফেরত পেয়ে থাকে।

৪) ইজারা : ব্যাংক কখনো কখনো ক্রেতার পক্ষ হয়ে গ্রাহকের অনুরোধে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রেতার ব্যবহারের জন্য তার কাছে হস্তান্তর করে। নির্দিষ্ট সময় শেষে গ্রাহক ব্যাংকের পণ্য ব্যাংকের নিকট ফেরত দেয় এবং ব্যবহারের সময়টুকুর জন্য ব্যাংককে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাড়া প্রদান করে।

এছাড়া ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কার্দ-এ-হাসান, বাই-মুয়াজ্জেল, বাই-সালামসহ অন্যান্য পণ্য বিভিন্ন ব্যাংকে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামি ব্যাংকসমূহ হচ্ছে :

১) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

২) আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

৩) সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

৪) এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড

৫) শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

৬) ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

৭) আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাজশাহী অঞ্চলের রেশম উৎপাদন কার্যক্রমে কোন ধরনের ব্যাংক নিয়োজিত?

ক. দেশি ব্যাংক　　খ. ভোক্তাদের ব্যাংক

গ. জাতীয় ব্যাংক　　ঘ. আঞ্চলিক ব্যাংক

২. মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা হলো–

i. সরকারকে সহায়তা দেওয়া

ii. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে কাজ করা

iii. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. i ও ii　　ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সম্প্রতি আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে মহিলা উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে 'ইকো ব্যাংকিং' নামে একটি মহিলা ব্যাংকিং কার্যক্রম নতুনভাবে চালু করার কথা ভাবছেন।

৩. মহিলাদের জন্য বিশেষ এই ব্যাংকিং কার্যক্রম কোন ব্যাংকিং শ্রেণিবিভাগের অন্তর্গত?

ক. কাঠামোভিত্তিক　　খ. মালিকানাভিত্তিক

গ. নিয়ন্ত্রণভিত্তিক　　ঘ. বিশেষ মক্কেলভিত্তিক

৪. মহিলাদের এই বিশেষায়িত ব্যাংক স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য কী?

ক. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা
খ. মহিলাদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা
গ. পৃথক ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করা
ঘ. মহিলাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহ দেওয়া

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মুদ্রা প্রচলন করে?
২. ব্যাংক ব্যবসায় সফলতার পূর্বশর্ত কোনটি?
৩. সর্বনিম্ন কতদিনের মেয়াদি আমানত করা হয়?
৪. অন্যান্য ব্যাংকের উপর অভিভাবকত্ব করে কোন ব্যাংক?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নবাবপুর হাটে নতুন করে ব্যাংকের শাখা দেখে রমিজ তার বড় ভাইকে প্রশ্ন করল যে, এই গ্রাম্য হাটে ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কি খুব বেশি? তখন রমিজের ভাই বলল যে, আমরা যে পাট ব্যবসায়ীরা এই গ্রামে আছি এই ব্যাংক আমাদের বিভিন্ন আর্থিক সমস্যা সমাধানকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং কাজকে অনেক সহজতর করবে এবং অল্প কিছুদিন পরই দেখা গেল যে, তাদের গ্রামের অনেকেই বিভিন্ন কলকারখানা স্থাপনসহ বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করলেন এই ব্যাংকের বিভিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে।

ক. পাবলিক লি. ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পরিচালক সংখ্যা কতজন থাকে?
খ. ব্যাংকের তারল্যনীতিটি ব্যাখ্যা করো।
গ. রমিজের ভাইয়ের বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে ব্যাংকের ভূমিকা পর্যালোচনা করো।
ঘ. ব্যাংকিং সেবা চালু করায় নবাবপুর হাটে স্থানীয় লোকেরা শিল্প-কারখানা স্থাপনে আগ্রহী হলেন- বিষয়টির সাথে তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা করো।

২. অরুণিমা ব্যাংক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে ২০০৮ সালে গঠিত হয়। বর্তমানে একজন ব্যক্তি ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করেন। তিনি ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম, জমি বন্ধক রাখতে আগ্রহী। কিন্তু তার সরবরাহকৃত তথ্য ও দলিলপত্রাদির মধ্যে যথেষ্ট অমিল রয়েছে।

ক. বিনিময় ব্যাংক কী?
খ. ব্যাংকিং কার্যক্রমে আর্থিক সচ্ছলতা কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো।
গ. অরুণিমা ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় কোন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দরকার হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. ব্যক্তিটিকে বন্ধকি ঋণ দেয়া অরুণিমা ব্যাংকের পক্ষে যুক্তিসংগত হবে কি না তা মূল্যায়ন করো।

দশম অধ্যায়

বাণিজ্যিক ব্যাংক

Commercial Bank

বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে ও অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে। বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা ও পরিচিতি, এর আয় ও ব্যয়ের খাতসমূহ চিহ্নিত করে উদ্দেশ্য মূল্যায়নপূর্বক কার্যা বলি সম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ে জানতে পারব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা ও পরিচিতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করতে পারব।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের খাতসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

১০.০ সূচনা

সাধারণভাবে ব্যাংক বলতে আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বুঝি। যুগের সাথে সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থায় অনেক আধুনিকায়ন ও বিশেষায়ণ ঘটেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত জনগণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে ঋণ গ্রাহকদের ধার দিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি মুনাফাভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা অর্থের লেনদেন ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে।

'মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে প্রতিষ্ঠান অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য সেবা লেনদেন করে থাকে, এ রকম প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়'। পরিশেষে বলা যায়, যে প্রতিষ্ঠান অর্থ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিয়ে ব্যবসায় করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে অভিহিত করা হয়। তবে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বহুদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

১০.১ বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য

বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত মুনাফা অর্জনের জন্য গঠিত হলেও তার আরও অন্যান্য উদ্দেশ্য আছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. **মুনাফা অর্জন :** মুনাফা অর্জনের মৌলিক উদ্দেশ্যেই বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠিত হয়।

২. **মূলধন গঠন :** জনগণের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় হিসেবে গ্রহণ করে বিনিয়োগের জন্য পুঁজি বা মূলধন গঠন (Capital Formation) তার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

৩. **বিনিময়ের মাধ্যম :** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চেক, হুন্ডি, বিনিময় বিলের প্রচলন করে থাকে।

৪. **জনকল্যাণ :** মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি জনকল্যাণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

৫. **ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণনীতি ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬. **পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা :** সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সাহায্য করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের আরেকটি উদ্দেশ্য।

৭. **সম্পদের সুষম বণ্টন :** অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে অর্থনীতির সকল খাতকে সমানতালে উন্নত করে সামগ্রিকভাবে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

৮. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

৯. **ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাসকরণ :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও ঋণদান কার্যক্রম সকল শ্রেণির জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, যা সমাজের ধনী-দরিদ্রের দূরত্ব হ্রাস করে থাকে।

১০. **সঞ্চয়প্রবণতা সৃষ্টি :** জনগণের মাঝে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

১১. নিরাপত্তা : মানুষের অর্থ, মূল্যবান গহনা ইত্যাদির নিরাপত্তা প্রদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

১২. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা : ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে বাজারে অর্থের চাহিদা পূরণ করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।

১৩. শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন : আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক সহযোগিতা প্রদান করে বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিশেষ লক্ষ্য।

১৪. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করাও বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

১০.২ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংক দেশের শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন রকম সেবা প্রদান করে থাকে। ব্যাংকের সেবাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি :

ক. প্রধান কার্যাবলি।

খ. বিশেষ ও অন্যান্য কাজ।

ক. প্রধান কার্যাবলি

১. আমানত গ্রহণ ও সুদ প্রদান : আমানতকারীর নিকট হতে তাঁদের সঞ্চয় বিভিন্ন প্রকার চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানত হিসাবে গ্রহণ করা ব্যাংকের একটি প্রধান কাজ। সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের আমানতকারীদের জমার অর্থের ওপর ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে থাকে। চলতি হিসাবে সুদ প্রদান করা না হলেও সেখানে অন্য কিছু সুবিধা দেওয়া হয়।

২. মূলধন গঠন : জনগণের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সঞ্চয়গুলো ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে একত্রিত করে, এর ফলে একদিকে ব্যাংকের তহবিল বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে গ্রাহকের বা আমানতকারীর মূলধন গঠিত হয়।

৩. ঋণ মঞ্জুর ও সুদ গ্রহণ : ব্যাংক জনগণের নিকট হতে সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে, সেই অর্থ ঋণগ্রহীতাদের বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। ঋণ প্রদান করা ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ ঋণগ্রহীতাদের ঋণ দিয়ে ব্যাংক একদিকে যেমন উৎপাদনমুখী কাজে সহায়তা করে, অন্যদিকে সেই ঋণের উপর যে সুদ আদায় করে তা ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস। ব্যাংক আমানতকারীদের যে হারে সুদ প্রদান করে ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে তার অধিকতর হারে সুদ আদায় করে। এটি নিট/প্রকৃত সুদ যা, ব্যাংকের কার্য পরিচালনাগত আয়ের একটি অংশ।

৪. ঋণ আমানত সৃষ্টি : ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের সাথে একটি হিসাব খুলতে হয়। ঋণের অর্থ সেই হিসাবে জমা বা ক্রেডিট করা হয়। এরপর ঋণগ্রহীতা যত পরিমাণ টাকা সেই হিসাব থেকে উত্তোলন করে, সেটা ওই হিসাবে ডেবিট করা হয়। এভাবে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে আমানতের সৃষ্টি করে।

৫. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি : আর্থিক লেনদেন ও দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসেবে ব্যাংক চেক বিনিময় বিল, প্রত্যয়পত্র, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির ব্যবহার করে থাকে।

৬. নোট ইস্যু : সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি মুদ্রা প্রচলন করে না, এটা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংক পরোক্ষভাবে মুদ্রা প্রচলনে সহায়তা করে। যেমন ধরা যাক তোমার সোনালী ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাবে ১ লক্ষ টাকা জমা আছে। এমতাবস্থায় তুমি যদি ৬০ হাজার টাকার কম্পিউটার ক্রয় কর তবে তোমার একাউন্টের চেকে তুমি টাকা পরিশোধ করতে পার। এভাবে ব্যাংক চেক কখনো কখনো বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে এবং মুদ্রার বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

৭. অছি হিসেবে কাজ : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের মক্কেলদের সম্পত্তির অছি (Trustee) এবং সংস্থার আর্থিক সচ্ছলতার সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে।

৮. আমদানি-রপ্তানিতে সাহায্য : আমদানিকারক দেশি মুদ্রা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ও রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে দেশি মুদ্রায় রূপান্তর করা প্রয়োজন, যা ব্যাংকগুলোর অন্যতম কাজ। আবার প্রত্যয়পত্র বা Letter of Credit (LC)-এর মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারককে আমদানিকারকের পক্ষ থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে। প্রত্যয়পত্র এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে আর্থিক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের মনোনীত ব্যাংক দুই পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। আমদানি-রপ্তানিসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন ও উপদেশ প্রদান করা ব্যাংকের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কার্য।

৯. সরকারের কোষাগার হিসেবে কাজ করে : কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা অন্য কোনো নির্বাচিত ব্যাংক সরকারের কোষাগার হিসেবেও কাজ করে থাকে।

১০. বিনিময় বিল ভাঙানো : ব্যাংক মক্কেলের পক্ষে বাট্টার মাধ্যমে বিনিময় বিল ভাঙিয়ে ব্যবসায় বাণিজ্যে সহায়তা করে থাকে।

খ. বিশেষ ও অন্যান্য কাজ

১. মূলধন বিনিয়োগ : ব্যাংক ঋণ প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগ করে, যা একটি দেশের মোট উৎপাদন ও মূলধন গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা : ব্যাংক একটি দেশের সার্বিক অর্থনীতি তথা শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, যোগাযোগ, গৃহনির্মাণ, শিক্ষার ব্যাপক অগ্রগতি তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩. অর্থ স্থানান্তর : ব্যাংক তার বিনিময় মাধ্যমের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে।

৪. অর্থের নিরাপত্তা প্রদান : ব্যাংক জনগণের অর্থ জমা রাখার মাধ্যমে অর্থের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। এ ছাড়া গ্রাহক তার মূল্যবান সম্পদের দলিলপত্র, অলংকারাদি লকার সেবার মাধ্যমে ব্যাংকের কাছে জমা রাখে।

৫. পরামর্শ দান : মক্কেলদের অনুরোধে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক পরামর্শ দেওয়া ও তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যেমন : বাড়িভাড়া আদায় করাও ব্যাংকের কাজ।

৬. কর্মসংস্থান : ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি দেশের কর্মসংস্থানের সহায়তা করে থাকে এবং দেশের অর্থনীতিতে ঋণ সরবরাহের কারণে পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের যোগান দিয়ে থাকে।

৭. ঋণ নিয়ন্ত্রণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রদত্ত ঋণের সংকোচন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একান্ত জরুরি।

৮. কৃষি উন্নয়ন : কৃষিক্ষেত্রে ঋণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে।

৯. শিল্পোন্নয়ন : ব্যাংক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘমেয়াদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করে থাকে।

১০. আঞ্চলিক উন্নয়ন : ব্যাংকের শাখা বিভিন্ন এলাকায় বিস্তৃত থাকায় একটি দেশের আঞ্চলিক উন্নয়নেও ভূমিকা রেখে থাকে।

কাজঃ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করো।

১০.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের উৎস

বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত নিম্নলিখিত উৎস থেকে তার তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। এর কিছু বহিস্থ উৎস আর কিছু অভ্যন্তরীণ উৎস।

১. পরিশোধিত মূলধন : ব্যাংকের প্রাথমিক তহবিলের উৎস হচ্ছে পরিশোধিত মূলধন। অংশীদারি কারবারি প্রতিষ্ঠান হলে মালিকগণ নিজেরা মূলধন সরবরাহ করে এবং যৌথমূলধনি প্রতিষ্ঠান হলে শেয়ার ইস্যু করে মূলধন গঠন করা হয়।

২. সংরক্ষিত তহবিল : প্রতিবছর মুনাফার একটি অংশ শেয়ারহোল্ডার বা মালিকগণের মধ্যে বণ্টন না করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখা হয় তাকে সংরক্ষিত তহবিল বলে। এই অর্থ ভবিষ্যতে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩. আমানত : বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক উৎস হচ্ছে আমানত। ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদে (যথা চলতি, সঞ্চয়ী, স্থায়ী) আমানত গ্রহণ করে থাকে, যা আমানতকারীরা একত্রে তুলে নেয় না। ফলে ব্যাংক এ অর্থ ঋণ অথবা বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবসায়ে খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করে থাকে।

৪. ধার গ্রহণ : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো হতে ঋণ নিতে পারে। আবার সিকিউরিটি বা ঋণপত্র বিক্রয় করেও মুদ্রা বাজার হতে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে।

১০.৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের উৎসসমূহ

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার ব্যবসায় হতে বিভিন্নভাবে আয় করে থাকে, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. ঋণের সুদ : বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তাদের ঋণ দেয় এবং এই ঋণের বিপরীতে সুদ গ্রহণ করে থাকে, যা তাদের আয়ের প্রধান উৎস।

২. বিনিয়োগ : বাণিজ্যিক ব্যাংক শেয়ার, ঋণপত্র, সরকারি সিকিউরিটি ইত্যাদি লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করেও মুনাফা অর্জন করে থাকে।

৩. বিল বাট্টাকরণ : মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ীদের প্রাপ্য বিনিময় বিল বাট্টা করেও অর্থ উপার্জন করে থাকে।

৪. ব্যাংকে ড্রাফট, ট্রাভেলারস চেক থেকে প্রাপ্ত কমিশন : ব্যাংক ড্রাফট, ট্রাভেলারস চেক থেকে কমিশন হিসেবে প্রচুর আয় করে থাকে।

৫. যোগাযোগ : বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলের অনুরোধে বিভিন্ন যোগাযোগ (Correspondance) সেবা প্রদান করে কমিশনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

৬. লকার ভাড়া : জনগণ তাদের মূল্যবান দলিল, গহনা ইত্যাদি ব্যাংকের লকারে জমা রাখতে পারে। যার বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সার্ভিস চার্জ আদায় করে থাকে।

৭. প্রতিনিধিত্ব : বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রতিনিধিত্বমূলক (Agency Service) লেনদেন করে থাকে। যেমন : চেক বা বিলের অর্থ আদায় বা পরিশোধ ইত্যাদি। এসব কাজের জন্য ব্যাংক কমিশন আদায় করে, যা তাদের আয়ের উৎস হিসাবে কাজ করে।

৮. শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে মধ্যস্থতা : শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে ব্যাংক আয় করে থাকে।

৯. বৈদেশিক বিনিময় : বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে থাকে।

১০. আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য : বৈদেশিক বাণিজ্যে ও লেনদেন নিষ্পত্তিতে ভূমিকা পালন করে কমিশন বা সার্ভিস চার্জ হিসেবেও বাণিজ্যিক ব্যাংক তার আয়ের একটি অংশ অর্জন করে থাকে।

১১. প্রত্যয়পত্র : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানিকারকদের প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) ইস্যু করে বাণিজ্যিক ব্যাংক কমিশন আদায় করে থাকে।

১২. অছি : অছি (Trustee) হিসেবে কাজ করেও ব্যাংক কমিশন আদায় করে থাকে।

১০.৫ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যয়ের খাতসমূহ

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত খাতগুলোতে ব্যয় করে থাকে।

১. আমানতকারীর আমানতের উপর সুদ প্রদান

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রদত্ত ধারের উপর সুদ প্রদান

৩. অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণের উপর সুদ প্রদান

৪. কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা ও বোনাস প্রদান

৫. পরিচালক ও ব্যবস্থাপকের ভাতা

৬. নিরীক্ষকের বিল

৭. অনাদায়ী ঋণের মামলা-মোকদ্দমার খরচ

৮. অফিস ঘরের ও গুদাম ঘরের ভাড়া

৯. শুল্ক ও কর

১০. বিমা প্রিমিয়াম

১১. যোগাযোগ খরচ যেমন: ডাক, তার, টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, সুইফট ইত্যাদি

১২. বিজ্ঞাপন খরচ

১৩. কর্মীদের প্রশিক্ষণ খরচ

কাজঃ তোমার এলাকায় অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে কোনটি অধিক জনপ্রিয় এবং জনপ্রিয়তার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়ের উৎস কোনটি?

ক. লকার ভাড়া
খ. বিমা প্রিমিয়াম
গ. শুল্ক ও কর
ঘ. নিরীক্ষকের বিল

২. প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনায় বাণিজ্যিক ব্যাংক–

i. প্রচারকার্যে ব্যয় করে
ii. সঞ্চয়ী হিসাবে জমানো অর্থের উপর মুনাফা দেয়
iii. শিক্ষানবিশ সেলামি প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

পোশাক ব্যবসায়ী রফিক সাহেব নিয়মিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত। তার ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি সর্বদা বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তা গ্রহণ করেন।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক রফিক সাহেবের পক্ষে–

i. বিদেশি ক্রেতা-বিক্রেতার দেনা-পাওনা পরিশোধে সহায়তা করে

ii. বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে

iii. বিনিয়োগকারীর মধ্যে মুনাফা বন্টন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কীসের প্রচলন করে?

২. ব্যাংক কীভাবে অর্থের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে?

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের মাঝে কীসের প্রবণতা সৃষ্টি করে?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মিসেস শীলা রোজারিও প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের উচ্চপদে আসীন বিধায় তিনি তার দুই প্রতিবেশী মোঃ আরাফ ও মৃদুল শেখকে তাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মৃদুল শেখ একজন আন্তর্জাতিক পাট ব্যবসায়ী এবং মোঃ আরাফের ব্যবসাটি হলো আবাসন প্রকল্পের, যেখানে কিনা তার বেশ বড় অঙ্কের ঋণের প্রয়োজন হয়। সে জন্যই তারা মিসেস শীলা রোজারিওর শরণাপন্ন হন। তিনি বললেন যে, এভাবেই আমরা চেষ্টা করি দেশের মানুষদের সেবা প্রদান করতে, জনগণের সেবাই তো আমাদের কাজ।

ক. কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য?

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীসের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে-ব্যাখ্যা করো।

গ. মিসেস শীলার কার্যাবলির ধরন বিবেচনায় তিনি কোন ধরনের ব্যাংকের কর্মকর্তা তা বর্ণনা করো।

ঘ. জনগণের সেবাদানই মূলত আমাদের কাজ- মিসেস শীলা রোজারিওর এই উক্তিটিকে মূল্যায়ন করো।

২. জনাব শায়লা শবনম বর্তমান সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে তার গহনা ও মূল্যবান দলিলপত্র নিয়ে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ কামনা করেন। সেখানে তাকে যে পরামর্শ দেওয়া হয় তা তিনি গ্রহণ করেন। তিনি জমি ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ নিয়ে সাভার যাওয়ার পথে টাকা হারিয়ে ফেলেন।

ক. ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের সাথে ঋণগ্রহণের সময় কী খুলতে হয়?

খ. সংরক্ষিত তহবিল কী? বর্ণনা করো।

গ. শায়লা শবনম তার মূল্যবান দলিলপত্র ও গহনার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. শায়লা শবনমের এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কী ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

একাদশ অধ্যায়

ব্যাংকের আমানত

Bank Deposit

ব্যাংক সাধারণত আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই অধ্যায়ে ব্যাংকের আমানত বা তহবিল সংগ্রহের উৎস, ব্যাংক হিসাব খোলা ও বন্ধ করার পদ্ধতি এবং আধুনিক ও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর নতুন কিছু পণ্যের সাথে আমরা পরিচিত হব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ব্যাংক আমানতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যাংক আমানতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যাংক হিসাবের ধরন বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হিসাব খোলার পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারব।
- আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পদ্ধতি মূল্যায়ন করতে পারব।

১১.০ ব্যাংকে আমানতের ধারণা

ব্যাংকিং ব্যবসায় তহবিলের মূল উৎস আমানত। ব্যাংকের আমানত বিভিন্নভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার হিসাব খোলার মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী ব্যাংক বিভিন্ন হিসাব খোলে প্রয়োজনীয় আমানত সংগ্রহ করে। বিশেষ করে চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের আমানত সংগ্রহ ও তার যথাযথ ব্যবহার করে।

১১.১ ব্যাংকে আমানতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

ব্যাংক আমানত বা হিসাবের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব গ্রাহক বা আমানতকারীর প্রেক্ষাপটে একধরনের, আবার ব্যাংকের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ধরনের হয়। আবার ব্যষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ব্যাংক আমানত কিছু ভূমিকা পালন করে। ১১.১ নং ছকে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

গ্রাহকের ক্ষেত্রে	ব্যাংকের ক্ষেত্রে	সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে
১. অর্থের নিরাপত্তা ২. ব্যবসায়িক লেনদেন ৩. ঋণের সুবিধা ৪. ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ ৫. সেবা অর্জন ৬. অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন মিটানো	১. তহবিলের মূল উৎস ২. বিনিয়োগ ৩. বৈদেশিক বিনিময়	১. সঞ্চয়প্রবণতা সৃষ্টি ২. পুঁজি বা মূলধন গঠন ৩. বিনিয়োগ ও উৎপাদন ৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

ছক নং ১১.১: ব্যাংকে আমানতের উদ্দেশ্য

ক. গ্রাহকের ক্ষেত্রে

১. অর্থের নিরাপত্তা : আমানতকারীদের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে নিরাপদে সংরক্ষণ করা ব্যাংক হিসাবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. ব্যবসায়িক লেনদেন : ব্যাংক নগদ অর্থ ও বিভিন্ন ব্যাংকিং পণ্যের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন করে। যেমন: চেক, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি।

৩. ঋণের সুবিধা : ব্যাংক চলতি, স্থায়ী হিসাবের মালিকদের প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করে থাকে। ফলে এ সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যও ব্যাংক হিসাব খোলা প্রয়োজন।

৪. ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ : ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যায়। শেয়ারবাজারের বিনিয়োগের মতো এটা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তাই এটি একটি ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ।

৫. সেবা অর্জন : হিসাব খোলার কারণে ব্যাংক তার গ্রাহককে নানাবিধ সেবা প্রদান করে, যা হিসাব খোলার জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে।

৬. অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন মিটানো : ব্যাংক তার গ্রাহককে চলতি হিসাবে জমাতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের সুবিধা দিয়ে থাকে, যা ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ করতে জনগণকে আকৃষ্ট করে।

খ. ব্যাংকের ক্ষেত্রে

১. **আমানত গ্রহণ :** বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে ব্যাংক তার তহবিল গঠন করে।

২. **বিনিয়োগ :** গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে ব্যাংক বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। সুতরাং লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিত করাও ব্যাংক হিসাবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩. **বৈদেশিক বিনিময় :** ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রারও ব্যবসা করে থাকে, যার জন্য গ্রাহককে কখনো কখনো হিসাব খুলতে হয়।

গ. সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে

১. **সঞ্চয়প্রবণতা সৃষ্টি :** ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সঞ্চয়প্রবণতার সৃষ্টি হয়।

২. **পুঁজি বা মূলধন গঠন :** ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অলস বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলো পুঞ্জীভূত হয়ে মূলধন সৃষ্টি করে থাকে।

৩. **বিনিয়োগ ও উৎপাদন :** ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তীতে দেশের উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. **কর্মসংস্থান :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে।

৫. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য :** ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার করে।

১১.২ ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদ

গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের হিসাব খোলার ব্যবস্থা রাখে। মানুষের জীবিকা, প্রয়োজন, সময় অবস্থান এবং চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক হিসাবকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকারভেদ করা যায়।

১. চলতি হিসাব

২. সঞ্চয়ী হিসাব

৩. স্থায়ী হিসাব

এই তিন ধরনের হিসাব ছাড়াও ব্যাংক অন্য যেসব হিসাবের সুবিধা প্রদান করে তা নিম্নরূপ :

৪. স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব

৫. বিমা সঞ্চয়ী হিসাব

৬. বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ী হিসাব

৭. ডিপোজিট পেনশন স্কিম হিসাব

৮. ঋণ আমানত হিসাব

৯. রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাব (RFCD)

১. **চলতি হিসাব :** যে হিসাবের মাধ্যমে প্রতিদিন বা সপ্তাহে যতবার খুশি টাকা জমা রাখা যায় এবং প্রয়োজনমতো চাহিবামাত্র যতবার খুশি টাকা উত্তোলন করা যায়, তাকে চলতি হিসাব (Current Account) বলে। ব্যবসায়ীদের জন্য এ হিসাব সুবিধাজনক এবং এ হিসাবে সাধারণত কোনো সুদ প্রদান করা হয় না। এই হিসাবে জমাতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করা যেতে পারে।

২. **সঞ্চয়ী হিসাব :** যে হিসাবের মাধ্যমে প্রতিদিন বা সপ্তাহে যতবার খুশি টাকা জমা রাখা যায়, কিন্তু সপ্তাহে শুধু দুইবার বা নিয়ম অনুযায়ী টাকা উত্তোলন করা যায়, তাকে সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account) বলে। সাধারণত অব্যবসায়ী নির্দিষ্ট আয়ের জনগণ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এ হিসাব খুলে থাকে। এ হিসাবে ব্যাংক স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে থাকে। তবে আজকাল কোনো কোনো ব্যাংক টাকা জমা বা তোলার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করছে না।

৩. **স্থায়ী হিসাব :** একটি নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদের জন্য যে হিসাব খোলা হয়, তাকে স্থায়ী হিসাব (Fixed Deposit) বলে। স্থায়ী হিসাবে সাধারণত এক মাস, তিন মাস, ছয় মাস, ১ বছর, ২ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি মেয়াদের জন্য টাকা জমা রাখা হয়। এ হিসাবে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ প্রদান করে তবে মেয়াদ পূর্তির আগে গ্রাহক তার টাকা উত্তোলন করতে পারে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে উত্তোলন করতে পারবে, তবে এক্ষেত্রে গ্রাহক কোনো সুদ পাবে না।

৪. **স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব :** স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এ-জাতীয় হিসাব খোলা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের সঞ্চিত টাকা এ হিসাবে জমা রাখতে পারে।

৫. **বিমা সঞ্চয়ী হিসাব :** এ হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাব এবং জীবন বিমার সুবিধাও পাওয়া যায়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আমানতকারীদের উক্ত হিসাবে জমা রাখতে হয়। উক্ত জমা টাকা উপর প্রাপ্ত সুদের কিছু অংশ হতে প্রিমিয়াম বাদ দেয়ার পর আমানতকারীর নামে মোট অঙ্কের বিমা করা হয় এবং গ্রাহক উক্ত বিমার সুবিধা ভোগ করে।

৬. **বৈদেশিক মুদ্রা স্থায়ী হিসাব :** বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ জাতীয় হিসাব খুলে থাকে। এ-জাতীয় হিসাবে একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন হয়ে থাকে।

৭. **ডিপোজিট পেনশন স্কিম হিসাব :** এ হিসাবের মাধ্যমে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিতে হয়। এভাবে দীর্ঘমেয়াদে টাকা জমা করে এবং মেয়াদ শেষে এককালীন ভিত্তিতে সুদসহ সকল টাকা ফেরত দেওয়া হয়। প্রতি মাসে ১০০, ২০০, ৫০০ টাকা থেকে যেকোনো অঙ্কের সাপ্তাহিক বা মাসিক জমা একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ জমাকারীকে ফেরত দেওয়া হয়। মুদ্রা বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি একটি বিশেষ গুরুত্ব বহনকারী হিসাব হিসেবে পরিচিত।

৮. **ঋণ আমানতি হিসাব :** কোনো ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা অন্য যেকোনো ঋণগ্রহীতা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করলে ব্যাংক নগদ অর্থে ঋণ প্রদান না করে গ্রাহকের হিসাবে টাকা স্থানান্তর করে। ঋণগ্রহীতা তার প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত হিসাব হতে চেক কেটে টাকা উত্তোলন করে। চেকের মাধ্যমে উক্ত টাকা উত্তোলন করে বিধায় পুনরায় কোনো না কোনো ব্যাংকে জমার মাধ্যমে নতুনভাবে ঋণ আমানত সৃষ্টি হয়।

৯. **রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাব :** সাধারণত সেসব বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য তৈরি, যারা নিয়মিত বিদেশ সফর করেন। বৈদেশিক সফরে সরকারি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের কোটা অনেক

সময় নিয়মিত সফরকারীদের জন্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় এই হিসাব বিশেষ ভূমিকা রাখে। সাধারণত আমদানি ও রপ্তানিকারীরা এবং বিদেশি কোম্পানির সাথে ব্যবসায়িক এবং উপদেশমূলক সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এই হিসাবের সুবিধা নিয়ে থাকে।

কাজ: একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তুমি কীভাবে সঞ্চয় করতে পার, তার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করো।

১১.৩ ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিবেচ্য বিষয়

তোমার আশপাশে অনেক ব্যাংক দেখা যেতে পারে। তুমি সিদ্ধান্ত নিলে যে ব্যাংকে একটি হিসাব খুলবে। কিন্তু কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে যে কোন ব্যাংকে কী ধরনের হিসাব খুলবে? ব্যাংক হিসাব খোলার পূর্বে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

১. **ব্যাংকের অবস্থান :** আমানতকারী সাধারণত হিসাব খোলার পূর্বে তার ব্যবসায়িক কেন্দ্রস্থল বা নিজস্ব বাসস্থান ইত্যাদির সাথে ব্যাংকের অবস্থান (Location of Bank) বিবেচনা করে থাকে।

২. **দক্ষতা :** ব্যাংকের কর্মচারীদের দক্ষতা ব্যাংকে হিসাব খোলার একটি অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। দুটি ব্যাংকের মধ্যে যে ব্যাংকটি কম গড় সময়ে সেবা প্রদান করতে পারে সেটি বেশি দক্ষ।

৩. **বহুমুখী সেবা :** যে ব্যাংক বহুমুখী সেবা প্রদান করে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে সে ব্যাংকই উপযোগী।

৪. **বৈদেশিক বিনিময় :** একটি ব্যাংকের সকল শাখা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তোমার যদি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের প্রয়োজন হয়, তবে যে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে অনুমতিপ্রাপ্ত সেই ব্যাংকেই হিসাব খোলা উচিত।

৫. **সুনাম :** ব্যাংকের সুনাম হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যে ব্যাংক সবার পরিচিত এবং অনেক দিনের পুরাতন, সেই ব্যাংকের সুনাম ভালো।

৬. **শাখা :** অধিক শাখাসম্পন্ন ব্যাংক গ্রাহকের জন্য উপযোগী।

৭. **তালিকাভুক্ত ব্যাংক :** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ভালো ভালো বাণিজ্যিক ব্যাংককে তালিকাভুক্ত ব্যাংক (Scheduled Bank) হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। অতালিকাভুক্ত ব্যাংকের চেয়ে তালিকাভুক্ত ব্যাংক সবার নিকট অধিক নিরাপদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৮. **ঋণসুবিধা :** যেসব ব্যাংকের ঋণ প্রদানের নীতি অপেক্ষাকৃত নমনীয়, সেসব ব্যাংক অপেক্ষাকৃত পছন্দনীয়।

৯. **সুদ :** যে ব্যাংকের আমানতের সুদ তুলনামূলকভাবে উচ্চ এবং ঋণের সুদ তুলনামূলকভাবে স্বল্প, সেসব ব্যাংক গ্রাহকদের কাছে বেশি গ্রহণীয়।

১০. **সেবার উপর চার্জ :** স্বল্প চার্জে অধিক সেবা প্রদানকারী ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য উত্তম।

১১. **ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং সেবা :** যেসব ব্যাংক অনলাইন, এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং, এটিএমসহ অন্যান্য ব্যাংকিং পণ্য বা সেবা প্রদান করে, তাদেরকে আজকাল গ্রাহকগণ বেশি বিবেচনায় নিচ্ছেন।

১১.৪ ব্যাংকে হিসাব খোলার পদ্ধতি

গ্রাহক তার চাহিদা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যাংকে বিভিন্ন রকমের হিসাব খুলতে পারেন। ব্যবসায় পরিচালনায় যখন প্রচুরসংখ্যক লেনদেন এবং বড় অঙ্কের লেনদেন হয়, তখন চলতি হিসাব খোলাই গ্রাহকের জন্য উত্তম। তাছাড়া লেনদেন এবং সঞ্চয় উভয় উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সঞ্চয়ী হিসাব খোলাই

শ্রেয়। তবে শুধু মেয়াদি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহক মেয়াদি হিসাব খুলে থাকেন। এ ছাড়াও যেকোনো ধরনের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহককে প্রথমেই গ্রাহক পরিচিতি ফর্ম পূরণ করতে হয়। ১১.২ নং চিত্রে একটি গ্রাহক পরিচিতি ফরমের নমুনা প্রদর্শিত হলো। এই ফর্মে সাধারণত গ্রাহক তার ও তার লেনদেন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন :

- গ্রাহকের নাম
- আয়ের উৎস
- জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের ফটোকপি
- গ্রাহকের পেশা
- গ্রাহকের ছবি
- নমিনির ছবি
- আমানতের পরিমাণ
- বর্তমান ঠিকানা
- স্থায়ী ঠিকানা
- কর্মস্থলের ঠিকানা
- ফোন নম্বর ইত্যাদি

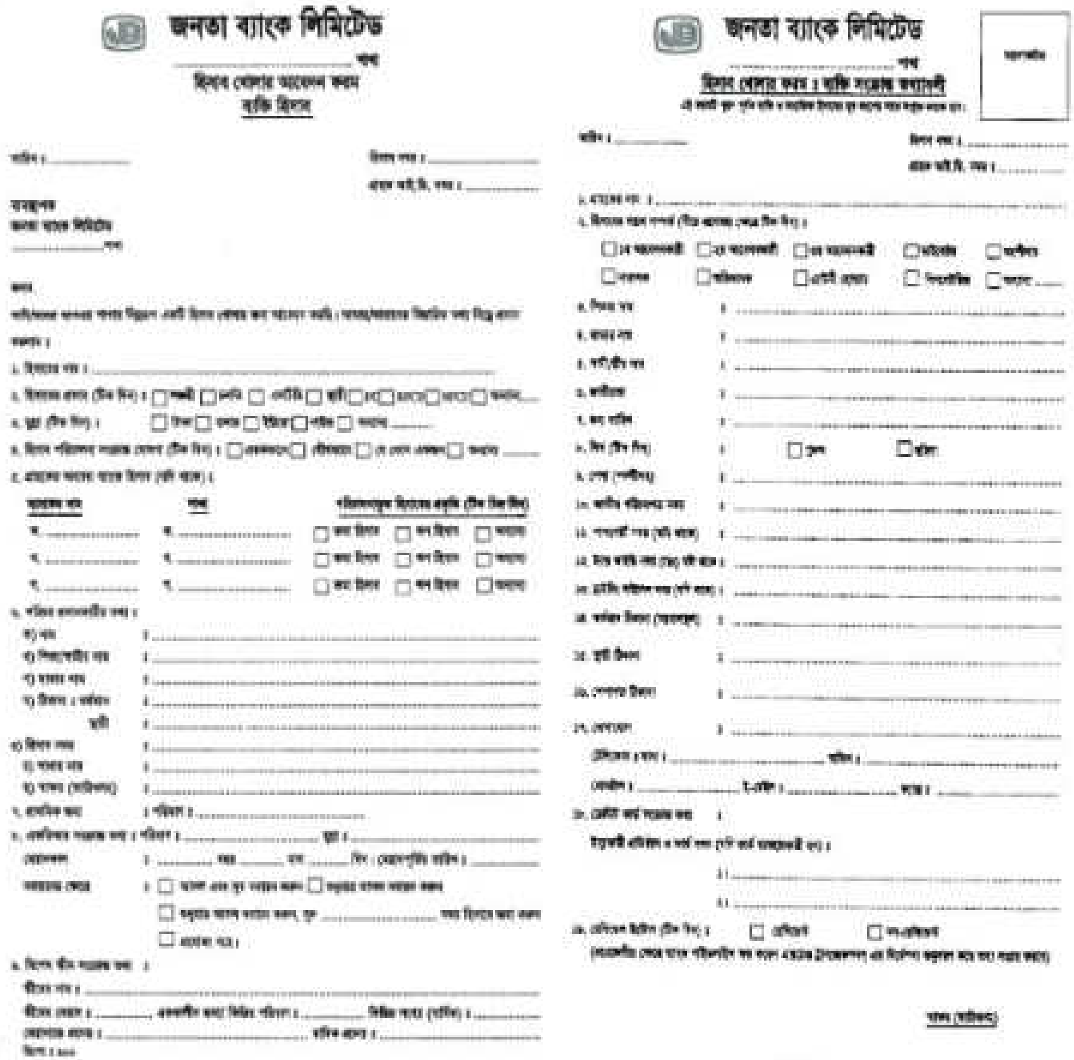

ছক নং ১১.২ : একটি ব্যাংকে হিসাব খোলার আবেদন ও গ্রাহক পরিচিতি ফরমের নমুনা

এই সকল তথ্যের সাথে একজন পুরাতন গ্রাহকের একটি পরিচিতি স্বাক্ষরসহ হিসাব খোলার জন্য আবেদন করতে হয়। ব্যাংক উক্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে সন্তুষ্ট হলে একটি ন্যূনতম জমা অর্থ জমা নিয়ে হিসাব খুলে দেয়। এই ফর্মের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ব্যাংকের তথ্যভান্ডারে সঞ্চিত থাকে। হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহকের ছবি এবং তার অবর্তমানে নমিনি-সংক্রান্ত তথ্য ও ছবি দেওয়া থাকে। হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহকের জাতীয় পরিচয় পত্র বা পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি প্রয়োজন হয়। কোম্পানির হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স ও কোম্পানির সভার সিদ্ধান্তের কপির প্রয়োজন হয়।

১১.৫ ব্যাংকে হিসাব বন্ধ করার পদ্ধতি

গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে করণীয় নিম্নরূপ :

১. হিসাব বন্ধ করার অনুরোধপত্র (কোম্পানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত সভার অনুরোধপত্র)।

২. অব্যবহৃত চেকবই, পাসবই, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ফেরত দিতে হবে।

কোনো ধরনের ঋণ না থাকলে গ্রাহকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ব্যাংক হিসাবটি বন্ধ করে দেয়।

১১.৬ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং-এর বিভিন্ন পণ্য ও সেবা

কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদির উন্নতি ও আধুনিকায়নের সাথে সাথে ব্যাংকিং ব্যবসায়েও বিভিন্ন রকমের ইলেকট্রনিক পণ্যের আবির্ভাব ঘটে। আধুনিক বিশ্বের তালে তালে বাংলাদেশও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর হয়েছে। এই সেবার ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং-সেবা পাওয়ার সুযোগ থাকে। এবার আমরা ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং সেবায় কিছু পণ্যের সাথে পরিচিত হব:

১. ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড

২. এটিএম

৩. মোবাইল ব্যাংকিং

৪. এসএমএস ব্যাংকিং

৫. ইন্টারনেট ব্যাংকিং

৬. এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং/অনলাইন ব্যাংকিং

৭. কল সেন্টার

১. ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড

এটা এক ধরনের ইলেকট্রনিক প্লাস্টিক কার্ড, যা ব্যাংক তার গ্রাহকের জন্য ইস্যু করে থাকে। এই কার্ডের মাধ্যমে নগদ টাকা ছাড়াই গ্রাহক কেনা-কাটা করতে পারে এবং প্রয়োজনে এটিএম মেশিন থেকে নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারে। ব্যাংকের হিসাবে টাকা থাকা সাপেক্ষে এই ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা যায়। ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, নিজের হিসাবে জমা থাকলেই কেবল ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে দোকান থেকে কেনা-কাটা করা যায়। কিন্তু হিসাবে জমা না থাকলেও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বাকিতে মালামাল ক্রয় করার সুযোগ থাকে। ক্রেডিট কার্ড একধরনের ব্যক্তিগত ঋণ, যা নির্দিষ্ট সময়ান্তে গ্রাহককে সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকে হিসাব থাকার বাধ্যবাধকতা নেই।

ছবি: ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড

২. এটিএম

ছবি: এটিএম

এটিএম (Automated Teller Machine) এক ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যার মাধ্যমে গ্রাহক ব্যাংকের কর্মচারীর উপস্থিতি ছাড়া প্রাথমিক কিছু লেনদেন করতে পারে । যেমন : টাকা উত্তোলন, হিসাবের বিবরণী, টাকা বা চেক জমা ইত্যাদি। সুতরাং ব্যাংকের নির্দিষ্ট সময়সূচির বাইরের সময়েও এই মেশিনের মাধ্যমে নগদ টাকা উত্তোলন করা যায়।

৩. মোবাইল ব্যাংকিং

ছবি: মোবাইল ব্যাংকিং

মোবাইল ব্যাংকিং একধরনের ব্যাংকিং সেবা, যার মাধ্যমে গ্রাহক ব্যাংকিং লেনদেন মোবাইলের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। গ্রাহকের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে এ ধরনের সেবা দেওয়া হয়। তাছাড়া বর্তমানে বিকাশ অ্যাপ ব্যবহার করে মোবাইলের মাধ্যমে অনেক লেনদেন হচ্ছে।

৪. এসএমএস ব্যাংকিং

ছবি: এসএমএস ব্যাংকিং

মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করাকে এসএমএস ব্যাংকিং বলে। যেমন : হিসাবের স্থিতি, চেক বইয়ের জন্য অনুরোধ ইত্যাদি।

৫. ইন্টারনেট ব্যাংকিং

ছবি: ইন্টারনেট ব্যাংকিং

ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহক ব্যাংকের একটি নিরাপদ ওয়েবসাইটে নাম এবং পাসওয়ার্ড দ্বারা নিবন্ধিত হয়ে থাকে। যথাযথ তথ্য প্রদানের পর গ্রাহক পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে যেকোনো সময় তার হিসাবের বিবরণী, তহবিল স্থানান্তর, বিল প্রদানসহ অন্যান্য লেনদেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতে পারে।

৬. এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং

ছবি: এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং

এর মাধ্যমে গ্রাহক এক জায়গায় অথবা একটি শাখায় হিসাব খুলে দেশের অন্য যেকোনো শাখায় তার লেনদেন করতে পারে। যেমন: ঢাকার ধানমন্ডিতে ব্যাংকের শাখায় হিসাব খুলে চট্টগ্রামে ব্যাংকের যেকোনো শাখায় লেনদেন করতে পারে।

৭. কল সেন্টার

এ সুবিধা গ্রহণ করার মাধ্যমে গ্রাহক বাসায় বসে কল সেন্টার-এর নম্বরে ফোন দিয়ে হিসাব সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারে এবং হিসাবসংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারে।

১১.৭ আধুনিক ও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা, তার ভবিষ্যৎ ও বাংলাদেশ

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্প সময়ে অর্থ স্থানান্তর, বিদেশ থেকে আসা রেমিটেন্স বিতরণসহ ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এ সেবা প্রদানে প্রাথমিকভাবে বড় অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। অবশ্য পরবর্তীতে কমিশন, সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে অধিকতর জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে সেবা

এবং আয় সব দিক থেকেই সুবিধাজনক হয় বলে বর্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ই-ব্যাংকিং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করছে। দূর দূরান্তে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকিং-সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ও ব্যাংকিং অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই ব্যাংক ব্যবস্থা বাংলাদেশে আরও সম্প্রসারিত হবে এবং ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল জনগোষ্ঠীকেই তার সেবা পৌঁছে দিতে পারবে। ২৪ ঘণ্টা ধরেই একজন গ্রাহক প্রায় সব ধরনের ব্যাংকিং-সেবা পেতে পারে বিধায় কর্মব্যস্ত গ্রাহকদের কাছে এই সেবা দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ই-ব্যাংকিং সেবা বাংলাদেশে সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় ব্যাংকিং-সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকবৃন্দ দিনে দিনে এই সেবার দিকে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আরও আগ্রহী হয়ে উঠছে এবং ই-ব্যাংকিং-এর জনপ্রিয়তা বাংলাদেশে উজ্জ্বল বলে প্রতীয়মান হয়।

কাজ : তোমার এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর কোন কোন সেবা বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গ্রাহকের জন্য ব্যাংক আমানতের উদ্দেশ্য কোনটি?

ক. ঋণের সুবিধা খ. মূলধন গঠন

গ. বিনিয়োগ ঘ. বৈদেশিক বিনিময়

২। বিপদমুক্ত টাকা বিনিয়োগের স্থান কোনটি?

ক. ব্যবসায় খ. শেয়ারবাজার

গ. ব্যাংক ঘ. বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মিন্টু বড়ুয়া তার পরিবারসহ কক্সবাজারে বেড়াতে যান। সেখানে যাবতীয় ব্যয় তিনি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কার্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। কার্ডের সঞ্চিত টাকা ফুরিয়ে এলে তিনি তার ভাইকে তার ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা করতে বলেন। অতঃপর তিনি কিছু টাকা উত্তোলন করেন এবং দুদিন পর পরিবারসমেত বেড়ানো শেষ করে ঢাকায় ফিরে আসেন।

৩। মিন্টু বড়ুয়া নিম্নের কোন মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করেছিলেন?

ক. অনলাইন ব্যাংকিং খ. এটিএম

গ. এসএমএস ব্যাংকিং ঘ. ইন্টারনেট ব্যাংকিং

৪। মিন্টু বড়ুয়ার সফর ফলপ্রসূ হয়েছিল–

i. ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে

ii. অনলাইন ব্যাংকিংয়ের কল্যাণে

iii. এসএমএস ব্যাংকিংয়ের সহায়তায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. ব্যাংকের কোন হিসাবে সুদ প্রদান করা হয় না?

খ. ব্যাংকের কোন হিসাবে গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সুদসহ টাকা উত্তোলন করতে পারবে না?

গ. রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাব কাদের জন্য প্রযোজ্য?

ঘ. কোন ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং পণ্যের জন্য ব্যাংকে হিসাব থাকার আবশ্যকতা নেই?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব আরিফ ঢাকার একজন ব্যবসায়ী। 'জাবেদ ব্যাংক' - এ তার একটি হিসাব রয়েছে। যা থেকে তিনি যতবার ইচ্ছা টাকা তুলতে পারেন। তিনি একবার বেড়াতে চট্টগ্রাম যান। তখন হঠাৎ বেশ সস্তায় ব্যবসায়িক পণ্য পান। ঐ ব্যাংকের কল্যাণে তিনি তা সময়মতো কিনতে সমর্থ হন। বাংলাদেশের যেকোনো জেলায় তাদের শাখা রয়েছে। তবে কোনো কার্ডের ব্যবস্থা নেই।

ক. ব্যাংকিং ব্যবসায়ের তহবিলের মূল উৎস কী?

খ. ব্যাংকে বিভিন্ন প্রকারের হিসাব খোলার ব্যবস্থা রাখা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. 'জাবেদ ব্যাংক'-এ জনাব আরিফের কোন ধরনের হিসাব রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ব্যাংকের একটি সেবা আরিফের মতো ব্যবসায়ীদের কাজকে সহজ করে দেয়-উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

২।

		শৈলী ব্যাংক	শৌখিন ব্যাংক
সেবা দানের পদ্ধতি ও পণ্যসমূহ	=>	সনাতন পদ্ধতি	কম্পিউটার ব্যাংক ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড এসএমএস পদ্ধতি এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং
কার্যক্রম শুরু	=>	২০০৫ সাল	২০০৫ সাল
পরিচালনা ব্যয় (বছরপ্রতি)	=>	২ কোটি	২ কোটি
লাভ	=>	৫০ লক্ষ	৮০ লক্ষ

বর্তমানে শৈলী ব্যাংকের পরিচালকরা 'শৌখিন ব্যাংক'-এর মতো সেবা চালু করতে চাচ্ছে।

ক. কে ভালো বাণিজ্যিক ব্যাংককে তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?

খ. কোন ধরনের হিসাব খুলে বিমার সুবিধাও পাওয়া যাবে? ব্যাখ্যা করো।

গ. শৌখিন ব্যাংকে কোন ধরনের ব্যাংকিং-সেবা চালু আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. শৈলী ব্যাংকে শৌখিন ব্যাংকের মতো সেবা চালু করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্যাংক ও গ্রাহক

Bank and Client

ব্যাংক একটি আর্থিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে গ্রাহক সেবা অন্যতম। অন্যদিকে গ্রাহকদেরও ব্যাংকের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্ক, গ্রাহকদের প্রতি ব্যাংকের বিভিন্ন দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবো।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে পারব।
- গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের এবং ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

১২.০ সূচনা

ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক এবং আস্থা ও বিশ্বাসই ব্যাংকিং ব্যবসার মূলমন্ত্র । এই সম্পর্ক সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তৈরি হয় এবং এই সম্পর্কের অবনতি ক্ষতিকর ব্যবসায়িক পরিণতি টেনে আনে।

১২.১ ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পর্কের ধরন

ব্যাংকিং ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তি, কর্পোরেশন অথবা কোম্পানিকে ব্যাংকার বলা হয়। তেমনি গ্রাহক বলতে ঐ ব্যক্তিকেই বোঝায়, যিনি ব্যাংকের যেকোনো ধরনের হিসাব অথবা অন্যান্য সেবার মাধ্যমে ঐ ব্যাংকের সাথে যুক্ত। ব্যাংক ব্যবসায়ে গ্রাহককে প্রদত্ত সেবা ও কার্যাবলিকে ভিত্তি করে ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্ক নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যায়:

১. ডেটর-ক্রেডিটর সম্পর্ক : ব্যাংক ও তার গ্রাহকের মধ্যে ডেটর-ক্রেডিটর সম্পর্ক (Debtor and Creditor Relation) বিদ্যমান। গ্রাহক যখন ব্যাংকের কাছে টাকা জমা দেয়, তখন ব্যাংক ডেটর এবং গ্রাহক ক্রেডিটর হয়, আবার বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে, যখন ব্যাংকের কাছ থেকে গ্রাহক ঋণ নেয়।

২. চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক : হিসাব খোলার মধ্য দিয়ে আইনগতভাবে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এতে করে দুই পক্ষেরই কিছু অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। এবং এই চুক্তির কারণে ব্যাংক তার আমানতকারীর জমাকৃত টাকা চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য।

৩. ব্যাংক গ্রাহকের অছি : ব্যাংক অনেক সময় তাদের গ্রাহকের সম্পত্তি যথা: স্বর্ণালংকার, দলিলপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের অছি হিসাবে কাজ করে থাকে। এটিও একটি আইনগত কিন্তু ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক।

৪. বন্ধক দাতা-বন্ধক গ্রহীতা সম্পর্ক : গ্রাহকের সম্পত্তির বিপরীতে ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার বন্ধকি ঋণ দিয়ে থাকে। এভাবে বন্ধক দাতা-বন্ধক গ্রহীতা সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

৫. ব্যাংক গ্রাহকের প্রতিনিধি (Agent) : গ্রাহকের পক্ষে দেনা পরিশোধ ও পাওনা আদায়ের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে থাকে।

১২.২ গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের দায়িত্ব

ব্যাংকিং ব্যবসার মূলনীতি অনুযায়ী গ্রাহকের স্বার্থরক্ষা ব্যাংকের একটি অবশ্যই পালনীয় পবিত্র দায়িত্ব, এ বিষয়ে ব্যাংকের নিম্নরূপ দায়িত্ব আছে।

১. অর্থ ফেরত : সাধারণভাবে ব্যাংক গ্রাহকের টাকা 'চাহিবামাত্র' ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। তবে এটা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পাদন হতে হবে। যেমন: চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবে যদি টাকা জমা থাকে তবে গ্রাহক চেক লিখে টাকা তুলতে পারে। এ ব্যাপারে ব্যাংকের অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে এ সংক্রান্ত কিছু বিধিনিষেধ গ্রাহককে মেনে চলতে হয়।

২. হিসাবের গোপনীয়তা : গ্রাহকের নির্দেশ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ, আইনগত অনুমতি অথবা আদালতের নির্দেশ ছাড়া ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে পারে না।

৩. আমানতকারীর নির্দেশ পালন : ব্যাংক তার মক্কেলের বা আমানতকারীর নির্দেশ অনুযায়ী আমানতের অর্থ ব্যবহার করে থাকে। যেমন: মক্কেল কোনো ব্যক্তি বা পক্ষকে অর্থ পরিশোধ করতে নির্দেশ দিলে ব্যাংক সেই অনুযায়ী পরিশোধ করে। একইভাবে মক্কেল যদি তৃতীয় কোনো পক্ষ হতে অর্থ, চেক বা বিল আদায় করার জন্য ব্যাংকের উপর আদেশ জারি করেন তখন ব্যাংক সেই নির্দেশ পালন করে।

৪. সুদের আদান-প্রদান : ব্যাংক তার মক্কেলের প্রাপ্য সুদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার হিসাবে জমা করে এবং সেবার ফি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার হিসাব থেকে কর্তন করে।

৫. সুবিধাজনকভাবে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান : ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে যথাযথ সুবিচার করবে এবং ঋণ পরিশোধের জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগ প্রদান করবে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ: পরিবার বা নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে এমন একজনকে খুঁজে বের কর যিনি কোনো ব্যাংকের গ্রাহক। গ্রাহক হিসেবে তিনি ব্যাংক থেকে কী কী সেবা প্রত্যাশা করেন তা জেনে একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

১২.৩ ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের দায়িত্ব

গ্রাহকের প্রতি যেমন ব্যাংকের দায়িত্ব আছে, তেমনি ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকদের কিছু দায়িত্ব আছে। গ্রাহকের করণীয় নিম্নরূপ :

১. সততা : ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেয়া গ্রাহকের একটি পরম দায়িত্ব। হিসাব খোলা থেকে শুরু করে সর্বাবস্থায় সঠিক তথ্য প্রদান করা গ্রাহকের অবশ্য কর্তব্য।

২. ঋণ পরিশোধ : ব্যাংকের নিকট হতে গৃহীত ঋণ চুক্তি অনুযায়ী সময়মতো পরিশোধ করা মক্কেলের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ না হলে ব্যাংক বন্ধকি সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রি করে আইনের মাধ্যমে তার পাওনা উদ্ধার করতে পারে।

৩. সুদ আদায় : চলতি হিসাবে জমাতিরিক্ত উত্তোলন হলে ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ব্যাংক সুদ কেটে নেয়। ব্যাংক অন্যান্য সুবিধা বা সেবা দিলেও তার জন্য একটি যুক্তিসংগত সেবা ফি কেটে নেয়। চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংকের ঋণের সুদ ও আসল প্রদান করাও গ্রাহকের দায়িত্ব।

৪. ঠিকভাবে চেক অঙ্কন : মক্কেল চেক অঙ্কনে সতর্কতা এবং নিয়মকানুন মেনে চলবে। যেমন- ঠিক স্বাক্ষর হতে হবে, তারিখ ঠিক হতে হবে, চেকে লিখিত টাকা হিসাবে জমা থাকতে হবে ইত্যাদি। চেক বলতে আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংকের উপর লিখিত আদেশ বুঝে থাকি।

চেক হচ্ছে একটি হস্তান্তরযোগ্য বিনিময় বিল, সাধারণত আমরা নিম্নোক্ত ধরনের চেক দেখতে পাই :

১. বাহক চেক: ব্যাংক এক্ষেত্রে চেকের বাহককে নগদ অর্থ দিতে বাধ্য থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ ধরনের চেক বহন করে ব্যাংকে উপস্থাপন করবে ব্যাংক তাকেই উক্ত চেকের অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকবে।

২. হুকুম চেক: যে চেকের অর্থ ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারে না এ ধরনের চেককে হুকুম চেক বলে। হুকুম চেকে সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা থাকে।

৩. দাগকাটা চেক: বাহক চেক বা হুকুম চেকের অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার জন্য যখন উক্ত চেকের বাম কোনের উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দুটি রেখা অঙ্কন করা হয় তাকে দাগকাটা চেক বলে। চেকের দাগ কাটা সমান্তরাল রেখার মধ্যে সাধারণত 'প্রাপকের হিসেবে দেয়' (A/C Payee) অথবা 'এন্ড কোং' লেখা থাকে। এ ধরনের চেকের অর্থ নগদে উত্তোলন না করে কোনো হিসাবে জমা দিয়ে টাকা উত্তোলন করতে হয়।

কাজ: সরবরাহকৃত বিভিন্ন প্রকার চেক পূরণ অনুশীলন।

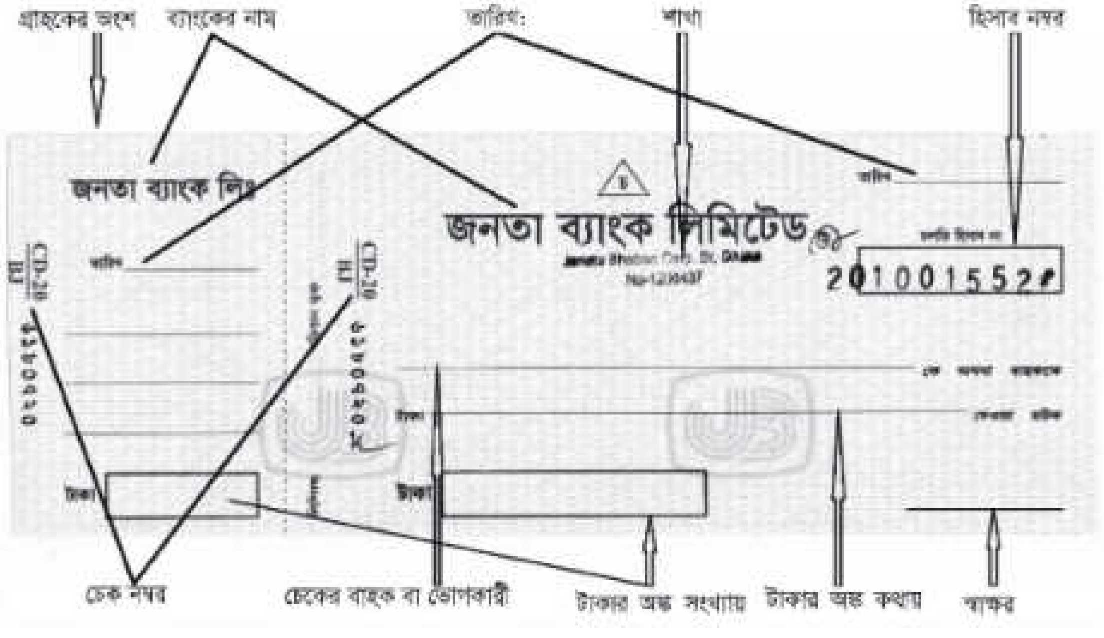

চিত্র নং ১২.১: একটি চেকের ছবি ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচয়

১২.৪ ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংক এবং গ্রাহকের সম্পর্ক বিশ্বাসের। শুধু বিশ্বাস ভঙ্গ, নৈতিকতার বিপর্যয় ও আইনের পরিপন্থি কোনো কিছু করলে এ সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। ব্যাংক এবং তার গ্রাহকের সম্পর্কের অবসান সম্ভাব্য আরো যে যে কারণে ঘটতে পারে, তা হচ্ছে –

১. **দেউলিয়া ঘোষণা :** গ্রাহক আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলেই ব্যাংকের সাথে তার হিসাবের চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

২. মক্কেল মানসিক ভারসাম্য হারালে : মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সুস্থভাবে লেনদেন পরিচালনা করা সম্ভব নয় এবং আইনানুগভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের অধিকার রাখে না, সেক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে মক্কেলের সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে।

৩. গারনিশি অর্ডার জারি করা হলে : আদালত কর্তৃক মক্কেলের উপর কোনো গারনিশি অর্ডার জারি করা হলে উক্ত মক্কেলের হিসাব সাময়িক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকে।

৪. ব্যাংকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত : মক্কেল যদি তার চুক্তি অনুযায়ী সততার নীতি মেনে না চলে বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়, সেক্ষেত্রে ব্যাংক মক্কেলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে।

৫. মক্কেলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত : মক্কেল যদি কোনো কারণে ব্যাংকের সাথে লেনদেন চালু না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে ব্যাংক ও মক্কেলের সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৬. যুদ্ধজনিত কারণে শত্রুতা : যুদ্ধজনিত কারণে ব্যাংক ও মক্কেল পরস্পর বিভক্ত অংশে অবস্থান করলে ব্যাংক ও মক্কেলের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

৭. সম্পূর্ণ জের স্থানান্তর : মক্কেল যদি তার হিসাবের সমুদয় জের অন্য কোনো ব্যক্তির হিসাবে স্থানান্তর করার জন্য ব্যাংকের উপর নির্দেশ জারি করে, তাহলে মক্কেলের হিসাব বন্ধ হয়ে যায় ও তাদের সম্পর্কের অবসান ঘটে।

৮. মৃত্যুজনিত কারণে : মক্কেলের মৃত্যু ঘটলে হিসাব বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যাংক মক্কেলের সম্পর্কের বিলুপ্তি হয়।

৯. দীর্ঘকালীন লেনদেন চালু না রাখা : মক্কেল যদি তার হিসাবের লেনদেন দীর্ঘ সময় চালু না রাখে, তাহলে ব্যাংক উক্ত মক্কেলের হিসাব বন্ধ করে দেয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চেক কী?

ক. চুক্তির দলিল খ. লিখিত নোটিশ
গ. আমানতকারীর লিখিত আদেশ ঘ. ব্যক্তিগত দলিল

২. ব্যাংক ও তার গ্রাহকের মধ্যকার সম্পর্ক মূলত –

i. ডেটর-ক্রেডিটর সম্পর্ক
ii. চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক
iii. সামাজিকতার সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৩. ঋণ পরিশোধে ঋণ গ্রহীতার প্রতি ব্যাংকের দায়িত্ব কোনটি?

ক. সুদ মওকুফ করা　　খ. উপযুক্ত বন্ধক রাখা

গ. স্বল্প পরিমাণ ঋণ দেওয়া　　ঘ. উপযুক্ত সময় দেওয়া

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র কী?

২. কোন কাগজের মাধ্যমে ব্যাংক আদেশ অনুযায়ী প্রাপককে টাকা দেয়?

৩. ব্যাংক কাদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে?

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

দীর্ঘদিন যাবৎ চালানোর পর বিদেশে স্থায়ীভাবে গমনের উদ্দেশ্যে মিসেস সাদিয়া তার সকল প্রকার ব্যাংক লেনদেন বন্ধ করেন।

৪. কী কারণে মিসেস সাদিয়ার সাথে ব্যাংকের সম্পর্কের অবসান ঘটে?

ক. আদালত কর্তৃক ঘোষিত সিদ্ধান্তের কারণে　　খ. ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

গ. দীর্ঘকাল লেনদেন না করার কারণে　　ঘ. মক্কেলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

সৃজনশীল প্রশ্ন

বহুদিন ধরে চেষ্টা করেও আবেদ তার বন্ধু রফিককে ব্যাংকে হিসাব খোলার ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম হননি, কারণ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও হারে সুদ পাওয়া যায় বলে রফিক সর্বদা তার অর্থকড়ি স্থানীয় পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত সমিতিতে রাখেন। কিন্তু গত কয়েক মাস পূর্বে তাদের ব্যবসার কিছু নতুন শাখায় প্রচুর মালামাল ও সাজ-সজ্জা সরঞ্জাম ক্রয়ে তাৎক্ষণিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় আবেদ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তুলে আনেন। কিন্তু রফিক তার ফুলপুর পৌর সমিতির কোষাধ্যক্ষকে বহু অনুরোধ করে দরখাস্ত দিয়েও সময়মতো টাকা তুলতে ব্যর্থ হন।

ক. ব্যাংকার কী?

খ. হুকুম চেক কী তা ব্যাখ্যা করো।

গ. আবেদের তাৎক্ষণিকভাবে টাকা তুলতে পারার কারণগুলো বর্ণনা করো।

ঘ. আবেদ ও রফিকের দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনটিতে টাকা রাখা লাভজনক? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

Central Bank

একটি দেশের অর্থ ও মুদ্রা বাজারের অন্তর্ভুক্ত থাকে বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা। এসব নীতিমালা প্রণয়ন, দিকনির্দেশনা প্রদান, এগুলোর বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ সর্বোপরি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই অধ্যায়ে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

ছবি: বাংলাদেশ ব্যাংক

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে পারব।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারব।

১৩.০ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার ব্যাংকের আবির্ভাব হওয়ায় মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই উপলব্ধি থেকে অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জন্ম লাভ করে। মুদ্রাবাজারকে আপন ইচ্ছা ও গতিতে চলতে না দিয়ে একটি সুসংগঠিত এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা সৃষ্টি এবং অর্থনীতির কল্যাণ সাধনই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সৃষ্টির পর থেকেই মুদ্রা প্রচলন, অর্থ সরবরাহ এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক পালন করে আসছে।

১৩.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি জনকল্যাণমূলক অমুনাফাভোগী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সর্বসাধারণের মঙ্গল নিশ্চিত করাই এবং দেশের অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলিকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যায়–

১. **বলিষ্ঠ মুদ্রাবাজার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য সুসংগঠিত মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) সাধনের উদ্দেশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত।

৩. **নোট ও মুদ্রা প্রচলন :** বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নোট ও মুদ্রা প্রচলন (Note Issue) ও নিয়ন্ত্রণ একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। আমদানি ও রপ্তানিকে দেশের অর্থনীতির অনুকূলে রাখতে হলে বৈদেশিক মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

৫. **দেশের মুদ্রা মান নিয়ন্ত্রণ :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে দেশীয় মুদ্রার মান অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে।

৬. **ব্যাংকসমূহের ব্যাংকার :** অন্যান্য তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর ব্যাংক হিসেবে কাজ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭. **নিকাশ ঘর হিসাবে কাজ করা :** গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যকার লেনদেন নিষ্পত্তি করে থাকে।

৮. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের পর্যাপ্ত হারে ঋণ সরবরাহ এবং অতিরিক্ত ঋণ সরবরাহ করলে ঋণ সংকোচন নিশ্চিত করে অর্থ বাজারকে স্থিতিশীল করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৯. **সরকারকে পরামর্শ দেয়া :** অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন ও সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

১০. মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা : অস্থিতিশীল মূল্যস্তর অর্থনীতিতে মন্দা ভাব দেখা দিয়ে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত রেখে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে থাকে।

১১. সরকারের ব্যাংক : সরকারের অর্থ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেন সম্পাদন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

১২. জনকল্যাণ : যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান নয়, তাই জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৩. সম্পদের সুষম বণ্টন : বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সম্পদের সুষম বণ্টন (Equitable distribution of wealth) নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

১৪. মূলধন গঠনে সহায়তা করা : কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ঋণ প্রদান করে তাদের গ্রাহকদের ঋণ প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে।

১৫. সুসংগঠিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা : পরিকল্পিতভাবে একটি সুসংগঠিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা (Establishing Organised Banking System) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য।

১৬. ব্যাংকব্যবস্থার পথপ্রদর্শক : দেশের অন্যান্য ব্যাংকসমূহের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৩.২ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার নিয়ন্ত্রক হিসেবে সরকার, জনগণ ও অন্যান্য ব্যাংক এবং সর্বোপরি দেশের উন্নয়নে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক কার্যাবলিকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি।

ক. সাধারণ কার্যাবলি :

১. নোট ও মুদ্রা প্রচলন : দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

২. মুদ্রাবাজারের অভিভাবক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক (Guardian of The Money Market) এবং মুদ্রার পূর্ণ নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে থাকে।

৩. সহজ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি : কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা, বিল, হুন্ডি ইত্যাদির মাধ্যমে সহজ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি (Creation of Easy Medium of Exchange) করে থাকে।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ : ব্যাংক হার নীতি, খোলাবাজার নীতি, জমার হার পরিবর্তন, নৈতিক প্ররোচনা ইত্যাদি পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Credit Control) করে।

৫. মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ : বাজারের অর্থ সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার মান তথা ক্রয়ক্ষমতা সংরক্ষণ করে থাকে।

৬. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, দেশীয় মুদ্রার সম্মানজনক বিনিময় হার সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৭. মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা : যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, ফলে মূল্যস্তরকে স্থিতিশীল রাখা (Maintaining Stability in Price) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরেকটি অন্যতম কাজ।

৮. বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল সংরক্ষণ : একটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ভর করে সেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল সংরক্ষণ (Maintaining Foreign Exchange Reserve) করে থাকে।

৯. ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার সেবা ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে।

১০. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি : নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও নতুন শাখা খোলার অনুমতি প্রদান করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Creating Employment) করে।

১১. সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের তদারক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি ঋণের তদারক করে এর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করে।

খ. সরকারের ব্যাংক হিসেবে সম্পাদিত কার্যাবলি

১. ঋণের উৎস : সরকার আর্থিক সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে, তাই এটি সরকারের ঋণের উৎস (Source of Credit) হিসাবে কাজ করে।

২. তহবিল সংরক্ষণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের তহবিল সংরক্ষণ (Maintaining Government Fund) করে থাকে।

৩. হিসাব সংরক্ষণ : সরকারের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ (Maintaining Govt. Account) করে থাকে।

৪. লেনদেন সম্পাদন : কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লেনদেন সম্পাদন (Handle Govt. Transactions) করে থাকে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় : দেশের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় (Purchase &

Sale of Foreign Currency) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

৬. উপদেষ্টা : কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নের উপদেষ্টা (Advisor) হিসেবে কাজ করে থাকে।

৭. তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (Collection & Maintainance of Different Statistics) করে থাকে।

৮. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনকারী : কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিদেশি ব্যাংক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থার সাথে সরকারের সম্পর্ক স্থাপন করে।

৯. সরকারের প্রতিনিধিত্ব : কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

গ. সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে সম্পাদিত কার্যাবলি

১. অনুমতিদান ও তালিকাভুক্তকরণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি ও তালিকাভুক্তির কাজ করে থাকে।

২. কার্যরত ব্যাংকের নতুন শাখা : বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যাংকের নতুন শাখার (New Branch) অনুমোদন কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রদান করে থাকে।

৩. নিকাশ ঘর : একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকই এক ব্যাংকের সাথে অন্য ব্যাংকের লেনদেন নিষ্পত্তি করে নিকাশ ঘরের (Clearing House) মাধ্যমে।

৪. ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল : ব্যাংকগুলো আর্থিক সংকটের সময় যখন কোনো উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, সে সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকসমূহকে ঋণ দিয়ে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল (Lender of the Last Resort) বলা হয়।

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুসংগঠিত নিয়মনীতি দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ (Controlling the Function of Commercial Banks) করে।

৬. হিসাবপত্র পরীক্ষা : কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সঠিক হিসাব সংরক্ষণে বাধ্য রাখে।

৭. উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা : কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন বিষয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৮. বাধ্যতামূলক তহবিল সংরক্ষণ : আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষণে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মোট আমানতের একটা অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ হিসেবে জমা রাখতে হয়।

৯. **অন্যান্য ব্যাংকের প্রতিনিধি :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য সদস্য ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

১০. **ঋণ আদায় :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ আদায় (Recovery of Loan) কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

১১. **বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নয়ন :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়নে (Developing Foreign Trade) বাণিজ্যিক ব্যাংককে সহায়তা করে থাকে।

ঘ. অন্যান্য কাজ

১. **কৃষি উন্নয়ন :** কৃষি খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কৃষি ব্যাংক স্থাপন বা কৃষি ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

২. **শিল্প উন্নয়ন :** শিল্প বিনিয়োগ উৎসাহমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে নীতিনির্ধারণসহ ঋণ সহযোগিতা করে থাকে।

৩. **সমবায় ব্যাংকের উন্নয়ন :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমবায়ের উন্নয়নে ঋণ-সুবিধাসহ নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়তা করে থাকে।

৪. **গবেষণা কার্যক্রম :** শিল্প-বাণিজ্য তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের উপায় উদ্ভাবন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গবেষণা কার্যক্রম (Research Work) পরিচালনা করে থাকে।

৫. **ঋণের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :** বাজারে প্রদত্ত ঋণের যথাযোগ্য উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

১৩.৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গঠন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়। সার্বভৌমের প্রতীক হিসেবে এবং অর্থব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা থেকে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আদেশ ১২৭ নামে অধ্যাদেশের মাধ্যমে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকাস্থ আঞ্চলিক ডেপুটি গভর্নরের কার্যালয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে। যদিও এই অধ্যাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি স্থায়ী ও কার্যকর কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি মালিকানায় পরিচালিত এবং একটি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যার নির্বাহী প্রধান গভর্নর। ৪ জন ডেপুটি গভর্নর, ১২ জন নির্বাহী পরিচালক এবং ১ জন অর্থনৈতিক

উপদেষ্টা নির্বাহী প্রধানকে সহায়তা করে থাকেন। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত হয়ে থাকে। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপন করা হলো:

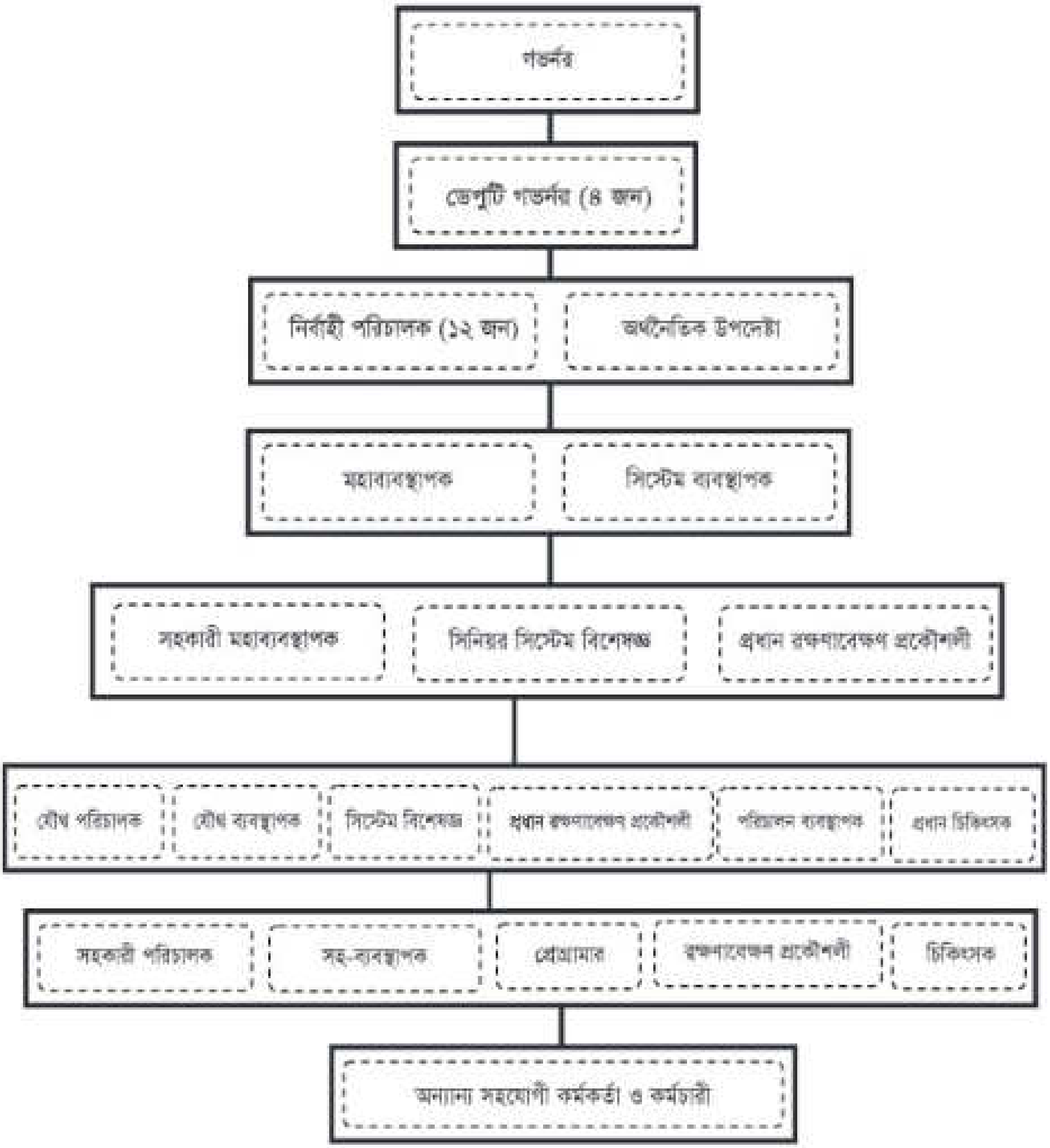

ছক নং ১৩.১: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গঠন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাণ্ডকে বিভাগভিত্তিক নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায় :

১. নোট ইস্যু বিভাগ
২. ব্যাংকিং বিভাগ
৩. হিসাব বিভাগ
৪. প্রশাসনিক বিভাগ
৫. ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
৬. ব্যাংকিং পরিদর্শন বিভাগ
৭. বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
৮. পরিসংখ্যান বিভাগ
৯. সচিব বিভাগ

কাজ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর বাণিজ্যিক ব্যাংকের নির্ভরশীলতার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করো।

১৩.৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পর্ক

অর্থনীতি বিশেষ করে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিম্নলিখিত সম্পর্ক বিদ্যমান :

১. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ : বাণিজ্যিক ব্যাংককে তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হয়। যা উভয়কে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে।

২. নিকাশ ঘর : নিকাশ ঘরের (Clearing House) দায়িত্ব পালন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

৩. কার্যবিবরণী : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সপ্তাহে এবং মাসে তাদের কার্যের বিবরণী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট পাঠাতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় উভয়ের মধ্যে গভীর সেতুবন্ধ গড়ে ওঠে।

৪. তথ্য সরবরাহকারী : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশ-বিদেশের অর্থবাজার, অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক-কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্ক আরও গভীর হয়।

৫. তারল্য : বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য (Liquidity) রক্ষা ব্যবস্থার কারণে উভয়ের মধ্যে আদেষ্টা-আদিষ্টের সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

৬. অভিভাবক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অভিভাবক (Guardian) হিসেবে কাজ করে।

৭. শেষ আশ্রয়স্থল : ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল (Lender of the last Resort) হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট সবচেয়ে আপনজন হিসেবে পরিচিত।

৮. সদস্যভুক্তির মাধ্যমে সুযোগ গ্রহণ : বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তার সদস্য হয়ে থাকে।

৯. ব্যাংকার-মক্কেল সম্পর্ক : প্রয়োজনের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। তাই এদের মধ্যকার সম্পর্ককে ব্যাংকার-মক্কেল সম্পর্ক বলে চিহ্নিত করা যায়।

১০. সহযোগী : কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার নীতি ও পরিকল্পনা বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে, আবার বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হতে বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে থাকে। এভাবে একে অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

১১. সব ব্যাংকের ব্যাংকার : সব ব্যাংকের ব্যাংকার (Banker of all Banks) হিসেবে কাজ করায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ।

কাজ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকে কী কী কাজে সহায়তা করে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

১৩.৫ অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবদান অনেক। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধানত :

১. কৃষিঋণ ও শিল্পঋণ বিতরণে সরকারের নীতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে।

২. তালিকা ও অতালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগ সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাসমূহকে পরিদর্শনের মাধ্যমে আইনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে।

৩. দেশের অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দফতরসমূহকে সজাগ রাখে।

৪. দেশের বৈদেশিক মুদ্রা, হস্তান্তর, স্থানান্তরে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ তার গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

৬. পল্লি ঋণ প্রকল্পসমূহ এবং বিশেষ ঋণ প্রকল্পসমূহকে তদারকির মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত শ্রেণিকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করে।

৭. বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন রকম কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৮. বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের চেষ্টা করেন।

৯. এছাড়া সরকারের গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে।

১০. বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য কোনটি?

ক. বিনিময়ের মাধ্যম
খ. মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা
গ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি
ঘ. সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি

২. কোন ব্যাংক অর্থের মান নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে?

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ. বিনিয়োগ ব্যাংক
ঘ. বিনিময় ব্যাংক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সিডর আক্রান্ত বরগুনার আলু চাষিরা ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য একত্রিত হয়ে 'প্রত্যয়' নামে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। এতে তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটে। পরবর্তী সময়ে সমিতির কার্যক্রম প্রসারের জন্য তারা প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সহায়তা গ্রহণের চিন্তাভাবনা করছে।

৩. 'প্রত্যয়' কার্যক্রমে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহায়তা করতে পারে?

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
খ. শিল্প ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক
ঘ. বিনিয়োগ ব্যাংক

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় 'প্রত্যয়'–

i. দেশের কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে
ii. ঋণসুবিধা পাবে
iii. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সব ব্যাংকের ব্যাংকার কে?
২. কোন ব্যাংক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে?
৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা প্রধান হিসাবে কে কাজ করেন?
৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কোথায় বাধ্যতামূলক তহবিল জমা রাখে?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. 'খ' ব্যাংকে কর্মরত একজন কর্মকর্তা ঈদের জন্য ব্যাংক থেকে নতুন টাকার নোট তুলে আনলে তার ৭ বছরের কন্যা সব টাকার নোটের উপর 'ক' ব্যাংকের নাম লেখা কেন তা জানতে চায়।

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন ব্যাংকের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে?

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ হিসেবে কী জমা রাখে? ব্যাখ্যা করো।

গ. 'ক' ব্যাংক কী ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'খ' ব্যাংকের তারল্য সংকটে 'ক' ব্যাংক কী ভূমিকা রাখবে? আলোচনা করো।

২. রামগড়ে স্থানীয় এলাকায় কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক না থাকায় এলাকাবাসীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ বিষয়ে প্রশাসনকে অবগত করলে সেখানে 'ক' ব্যাংকের একটি শাখা চালু হয় এবং এলাকাবাসী সকলেই উপকৃত হয়। পরবর্তী সময়ে 'খ' ব্যাংকের একটি শাখা কার্যক্রম শুরু করে। কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'খ' ব্যাংককে বন্ধের নোটিশ দেয়।

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীসের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পারস্পরিক লেনদেন নিষ্পত্তি করে?

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনটি স্থিতিশীল রাখে ব্যাখ্যা করো।

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'খ' ব্যাংককে কেন বন্ধের নোটিশ দেয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রামগড়ের মতো এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ক' ব্যাংককে কীভাবে কাজে লাগাতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং

বুদ্ধিহীনের কাছ থেকে পরামর্শ না নেওয়াই ভালো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।